রক্তের অক্ষর

রি জি য়া র হ মা ন

রক্তের অক্ষর
রিজিয়া রহমান

লেখকের অন্যান্য বই

শ্রেষ্ঠ উপন্যাস
ঘর-ভাঙা ঘর
উত্তর পুরুষ
ধবল জ্যোৎস্না
শিলায় শিলায় আগুন
সূর্য-সবুজ রক্ত
একাল চিরকাল
বাঘ বন্দি

মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস
বং থেকে বাংলা
কাছেই সাগর
উৎসে ফেরা

প্রেমের উপন্যাস
সবুজ পাহাড়
প্রেম আমার প্রেম
ঝড়ের মুখোমুখি
হে মানব মানবী
অতলান্ত নীল
বান্ধবী প্রিয় দর্শিনী
গোলাপ তবু তুমি
চন্দ্রাহত
অন্ধকারে বেতোফেন

ঐতিহাসিক উপন্যাস
অলিখিত উপাখ্যান

সামাজিক ও রাজনৈতিক উপন্যাস
হারুণ ফেরে নি
সুপ্রভাত সোনালি দিন
জগৎ জুড়িয়া কান্দে
জ্যোৎস্নায় নীল
সীতা পাহাড়ে আগুন

হাসির উপন্যাস
প্রজাপতি নিবন্ধন

আত্মজৈবনিক
অভিবাসী আমি
নদী নিরবধি
প্রাচীন নগরীতে যাত্রা

গল্প সংকলন
অগ্নি স্বাক্ষরা
নির্বাচিত গল্প
দূরে কোথাও
প্রিয় গল্প
চার দশকের গল্প

রম্য গল্প সংকলন
খাওয়া-খায়ির বাঙালি

শিশুতোষ ও কিশোর গ্রন্থ
ঝিলিমিলি তারা (ছড়া)
রাজার ছড়া (ছড়া)

আবে রওযাঁ
আলবূর্জের বাজ

নৃতাত্ত্বিক উপন্যাস
শুধু তোমাদের জন্য
পবিত্র নারীরা
তৃণভূমির বাইসন

মতিশিলের বাড়ি ও অন্যান্য গল্প
আজব ঘড়ির দেশে (সায়েন্স ফিকশন)

অনুবাদ
সোনালি গরাদ (মালয়েশিয়ার উপন্যাস)
রিজিয়া রহমানের গল্পের ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থ
Caged in paradise and other stories

ISBN - 978-984-33-5807-3

উৎসর্গ

মোহাম্মদ মীজানুর রহমানকে

সকালটা এখানে অকেজো নেশাখোরের মতো ঝিম ধরে পড়ে আছে। পলেস্তারা খসা ইট বের করা দেওয়ালে সরু রোদের রেখা বিনা পয়সার খরিদ্দারের মতো বেহায়াভাবে লুটোপুটি খাচ্ছে। ময়লা উপচানো ড্রেনের ধারে কয়েকটা শালপাতার ঠোঙা আর ছেঁড়া তেল-চপচপে কাগজ নিয়ে গৃহবিবাদে রত একদল কাক। একটু দূরেই একটা ঘেয়ো কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। আর কোনো শব্দ নেই।

কুসুম উঠেছে সকালেই। সবার আগে এ পাড়ায় সে ওঠে। তখনো বকুল, জাহানআরা, সখিনা, মর্জিনা সবাই হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রীভাবে ঘুমিয়ে থাকে। গলির ভেতর মান্নানের দোকান ঝাপ খোলে না। শুধু রাস্তার ও-ধারে ডালপুরি আর গোলগোল্লার দোকানের ছোকরাটা সবে চুলোয় আঁচ ধরায়।

বারোয়ারি পায়খানায় একটু পরেই তো রেশনের লাইন লেগে যাবে। তারপর কুয়োতলার কাছে শেওলা-ধরা জায়গাটুকুতে পানির হাঁড়ি, কলসি, বালতি জমবে। শুরু হবে একটা যুদ্ধ। ঝগড়া, চিৎকার, অশ্লীল গালাগালিতে গলিটায় তখন কান পাতা দায়। ওদিক থেকে গোলাপজান বুড়ির অনবরত কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছে। ভোর-রাত থেকে কাশতে শুরু করে বুড়ি। বুড়ি এখন এখানে-ওখানে পড়ে থাকে। রূপা, আমিনা, মতির ঘরের দরজার সামনে সিমেন্ট উঠে যাওয়া ইটের ওপর দলা পাকিয়ে পড়ে আছে গোলাপজান। সবাই জানে গোলাপজান আগে এ পাড়ায় ব্যবসা করত। পরে বাড়িওয়ালি হয়েছিল। এখন বুকের কখানা পাঁজরসর্বস্ব অথর্ব শরীরটা ছাড়া কিছুই নেই। বেলা যখন দু'সারি ভাঙা দালানের মধ্যে আবছা ঘষা ঝাপসা আলোর আভাস ফেলে, গোলাপজান তখন উঠে খোলা দরজাগুলোর সামনে হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সখিনাদের ডালপুরি আর চায়ের গ্লাসে লোলুপ দৃষ্টি মেলে হাত পাতে — একটু চা দিবি লো?

সখিনা মুখিয়ে ওঠে। ঠাস করে কাচের গ্লাসটা নামিয়ে রাখে — যমে চক্ষে দ্যাহে না বুড়ি তরে? আমাগো নিজের নাই খাওনের ঠাঁই। তিন দিনে পাঁচটা কাস্টমার পাইছি।

সখিনারা দু' বোনে মিলে ব্যবসা করে। ওর মা-খালা-নানিও ব্যবসা করত।

সখিনা চোখ ঘুরিয়ে জাহানআরার বন্ধ ঘরের দরজায় তাকিয়ে ঝামটা দেয় — ক্যান লো বুইড়্যা মাগি! জাহানআরার ধারে যাইবার পারস না? দিনে একশবার কাপড় বদলায়। ঠিল্লা ঠিল্লা পানি কিনে। চাকর খাডায়। দেমাগ কত।

ওদিকে তখন একটা-একটা করে ঘরের দরজা খোলে। এদিক-ওদিকের ঘর থেকে মেয়েরা বেরিয়ে আসতে থাকে। কুসুম কুয়ো থেকে এক বালতি পানি তুলে হাত-মুখ ধোয়। সবুজ জমাটবদ্ধ পচা পানির কুয়ো। মাসি বলে — ওইগুন কি আর কুয়োর জল আছে! ওর মইধ্যে পচা মানুষের রক্ত।

মাসি এই দীর্ঘবছরে ওই কুয়োর মধ্যে অনেক খুনের লাশ পড়তে দেখেছে।

কুসুমের তাতে পরোয়া নেই। ঠিকা মাসিকে দিয়ে বড় রাস্তার কল থেকে পয়সার পানি কিনবার মর্যাদায় সে এখনো ওঠেনি। চোদ্দ বছরের অপুষ্ট শরীরটায় ব্যবসা জমাবার বিত্ত এখনো গড়ে ওঠেনি।

আধটিন পানি হাতে-মুখে-মাথায় দিয়ে কুসুম ঘরে এলো। কুসুমের ঘরের আরো দুজন মেয়ে উঠে পড়েছে। শান্তি উঠে বসে হাই তুলল। খালি গায় আধময়লা শাড়ি জড়িয়ে জরিনাকে ধাক্কা দিল — ওই জরি! ওঠ মাগি। আর কত ঘুমাবি?

জরিনা ঝাড়া দিয়ে শান্তির হাত সরিয়ে তেল চিটচিটে বালিশটা পুরো দখলে নিয়ে আয়েশ করে পাশ ফিরল।

শান্তি মুখ ভেংচি কাটল — ইঃ, ঠমক কত! য্যান রাইত ভইরা ডজনে ডজনে মানুষ বসাইছে।

তারপর বালিশের তলা থেকে সিগারেট আর ম্যাচ বের করে সিগারেট ধরাল। কুসুমের দিকে তাকিয়ে বলল — ওই কুসমি! দ্যাখ তো ঠিকা মাসি আইছে নি! আইলে দোকান থনে দুইডা ডাইলপুরি আইনা দিতে কবি।

কুসুমের দিকে দুটো নোট ছুড়ে দিল শান্তি। এ ঘরে কুসুম ছাড়া শান্তি ও জরিনা দুজনেই স্বাধীন ব্যবসা করে। ঘরের ভাড়া ওরা নিজেরাই দেয়। কুসুমের রোজগারের টাকার মালিক কালু। কুসুম এখনো ওর অধীন। তিনজনের মধ্যে শান্তিরই রোজগার ভালো। ও ওর রেট বাড়িয়েছে। শান্তির বাজার এখন উঠতির দিকে।

কুসুম নোট নিয়ে বেরিয়ে গেল। কাল তার খরিদ্দার জোটেনি। রাতে খাবারও জোটেনি তাই। আজ কেমন কাটবে কে জানে!

ঠিকা মাসি এসে গেছে। ঘরে ঘরে কলসি নিয়ে রাস্তার কল থেকে পানি এনে দিতে ব্যস্ত সে। মেয়েরা অনেকে বাবুর কাছে পয়সা দিচ্ছে। তেহারি আর বাখরখানির জন্য। বাবু এ পাড়ারই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে বলতে গেলে। সবারই খরিদ্দার ছিল সে। এখন একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে। বাঁধা মেয়েও আছে। বাবু মানুষটা ভালো। সবারই ঠেকা-অঠেকায় কাজ-কাম করে দেয়। বাবু তেহারি, বাখরখানি, নান কিনে আনে। অবশ্য তেহারি, নান আসে মাত্র হাতে গোনা ক'টা ঘরে। জাহানআরা, বকুল, মনু রোজই দু'বেলা মাংস খায়। দু'বার গোসল করে। তাছাড়া অনেক বড়লোকি অভ্যাস আছে ওদের।

কুসুম টাকা নিয়ে বকুলের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ঠিকা মাসি এক কলস পানি বকুলের ঘরের সামনে নামিয়ে দিয়ে হাঁক পাড়ল — কইগো বুজি। পানির পয়সাডা দিয়া দেও। সময় নাই আমার খাড়নের।

আধভেজানো দরজার মধ্য দিয়ে বকুলের ঘরের কিছুটা চোখে পড়ল কুসুমের। এ ঘরটা বকুলের একার। দিন তিরিশ টাকা ভাড়া দিয়ে একাই থাকে সে। বকুল এ পাড়ার উঠতি ভাগ্যবতীদের একজন। ঘরের তক্তপোষের ওপরে তোষক বিছায় সে। দেয়ালে বড় চারকোনা ফুলআঁকা আয়না টাঙানো। গোলাপফুল আঁকা রংচঙে তোরঙ্গের ওপরে বকুলের একখানা ফটোও সাজান আছে। এ পাড়ায় সব মেয়েরই ফটো তোলার ঝোঁক। অনেকেই বোরকা চড়িয়ে বড় রাস্তার ধারের স্টুডিওতে গিয়ে নানা ভঙ্গিমায় ছবি তুলে আসে। কুসুম কখনো ফটো তোলেনি। ফটো তুলতে যাওয়া দূরে থাক, এ গলির বাইরেটায় পর্যন্ত যাবার হুকুম নেই তার।

খাটো ঝুলের লাল পেটিকোট আর হাতা-কাটা ব্লাউজ পরে ঘুমের চোখে উঠে এলো বকুল। দরজার একটা পাটে হাত রেখে বিরক্তকণ্ঠে বলল — চিল্লাইয়া পাড়া মাথায় উঠাইছস ক্যান লো মাগি? দেহস না ঘরে মানুষ আছে!

কুসুম উঁকি মেরে দেখল বকুলের বিছানায় ওর বাঁধা-মানুষ ঘুমোচ্ছে।

ঠিকা মাসি কোমরে গোঁজা বিড়ি বের করে ধরাল। মুখে অমায়িক সখ্যতা এনে জিভ কাটল একটু — তাই নিহি? তা বুয়া পয়সাডা দেও। যাই, ওইদিকের ঘরে ঠিল্লা দেওন লাগব।

বকুল ঘর থেকে পয়সা ছুড়ে দিল — নে, যা। বকুলের পয়সা বাকি থাকে কবে!

কুসুম এতক্ষণে টাকা বাড়িয়ে দিল মাসির দিকে — ও মাসি, আমাগো ঘরে দুইটা ডাইলপুরি আর এক কাপ চা দিতে কইছে শান্তি বুজি।

বকুলের দেওয়া পয়সা কুড়িয়ে নিয়ে গজগজ করল মাসি — এক হাতে কত করি কও?

তবু কুসুমের হাত থেকে নোট দু'টো নিল। বকুলের মতো শান্তিকেও সে আজকাল একটু খাতির করতে শুরু করেছে। বলা তো যায় না, শান্তি হয়তো বকুলকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে।

মাসিকে পয়সা দিয়ে ড্রেনের পাশে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল কুসুম। ড্রেন থেকে পচা

জমাট ময়লার বাসি গন্ধ উঠছে। শরীরটা ঝিম ঝিম করছে। কুসুমের কাল দুপুরেও খাওয়া হয়নি। পেটটায় মোচড় দিচ্ছে। নিরুৎসুক চোখে ভাঙা দালানের ওপর দিয়ে সরলরেখার মতো একচিলতে সকালের আকাশে চোখ রাখল সে। ময়লা পায়জামার ওপর ডোরাকাটা গেঞ্জিটা দু'সপ্তাহ ধোয়া হয়নি। আজ সে শান্তির কাছে একটু সাবান চাইবে। না হয় কুয়োর পচা পানিই দু'মগ মাথায় ঢেলে গোসল করে নেবে। বকুলের ঘরের দিকে একবার ঈর্ষার দৃষ্টি বুলিয়ে আনল কুসুম। বকুলের মতো অমন একটা শরীর তো তারও হতে পারত। আরো কতদিন লাগবে অমন উরু, বুক আর পেছনের নিচের অংশ হতে?

জরিনা বলেছে, 'প্যাট ভইরা খাইলেই গতরে মাংস হইব। তখন দেহিস কাস্টমার হামলাইয়া পড়ব। তখন শান্তির মতো মাথায় বাস-ত্যাল দিবি, বকুলের মতো শাড়ি পিনবি, জাহানআরার মতো গাড়ি চইড়া শহরের বড় দালানে যাবি। মাসি খাতির করব। বাবু হাত কচলাইব। কালু সর্দার আইয়া সিগারেট সাধব। গতর বানা, প্যাটে ভাত দে।'

কিন্তু পেট ভরে খাওয়া দূরে থাক, পেটে ভাত পড়ে কুসুমের কদিন তা আঙুলে গোনা যায়। সে তো আর শান্তি, জরিনাদের মতো স্বাধীন রোজগারি নয়। দু'বছরের বেশি হয়ে গেল এখনো সে কেনা রোজের মেয়ে। মানুষ পেলে, পয়সা এলে তার কেবল ডাল-ভাত খাবার অধিকার। খরিদ্দার পয়সা দিয়ে যায়। সে দেয় বড় মাসির হাতে। মাসি দেয় কালুর হাতে।

ওই যমের মতো লোকটা কালও তাকে দু'টো ভারি ওজনের লাথি মেরে গেছে। তলপেটে এখনো চাপধরা ব্যথা হয়ে আছে। কদিন আগে খরিদ্দারের পকেট থেকে একটা টাকা হাতসাফাই করেছিল কুসুম। লুকিয়ে রেখেছিল লবণের কৌটায়। রোজের পয়সা তো সে চোখেও দেখে না। তবু যেদিন রোজ দিতে পারে না, সেদিন ভাত-ডালও আসে না। দুদিন রোজ দিতে পারেনি কুসুম। লোক পায়নি। ভাতও পায়নি। ঠিকে মাসিকে দিয়ে মুড়ি কিনে লুকিয়ে ঘরে ঢুকছিল। কালু কোথা থেকে ঝড়ের মতো এসে পড়ল। এক থাবায় মুড়ির ঠোঙাটা ছিনিয়ে নিল হাত থেকে — ওই মাগি! পয়সা পাইছস কই?

ভয়ে কুসুমের মুখ শুকিয়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল। কালুর কপালের ওপর কাটা শুকনো দাগটায় তাকিয়ে থতমত খেয়েছিল সে। বলেছিল — শান্তি বুজি দিছে।

মুড়ির ঠোঙাটা ড্রেনে ফেলে কুসুমের চুল ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুরিয়ে ফেলে দিয়েছিল কালু

— হারামজাদি, মিছা কথা কস। ক কত পয়সা কাস্টমারের থনে লইছস। রেটের ট্যাকা তো মাসিরে দিয়া দিছস। তয় ট্যাকা পাইলি কই?

ড্রেনের পাশে ছিটিয়ে পড়া মুড়িগুলো গোলাপজান বুড়ি হামাগুড়ি দিয়ে এসে কুড়িয়ে তুলতে শুরু করেছে। পাগলি করিমন আর সখিনার পাঁচ বছরের মেয়েটাও ছুটে এসে কাড়াকাড়ি করে মুড়ি সাপটে তুলতে লেগেছে। সেদিকে একবার তাকিয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল কুসুম। কালুর বসন্তের দাগে আঁচড়-কাটা মুখে, ঝুলে-পড়া ঠোঁট আর কপালের কাটা দাগটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে প্রস্তুত হলো। কী করবে কালু? মারবে? মার তো সে প্রায়ই খায়। মাসি বলে, কালু হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারে। কালুর প্রচণ্ড একটা চড় এলে পড়ল কুসুমের গালে। মাথাটা ঘুরে উঠল। দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে কুসুম মাথা সোজা করল — পয়সা কাস্টমারের পকেট থিকা নিছি। নিমু তো। আমি পেট ভইয়া খামু না? আমার খিদা লাগে না?

ততক্ষণে কালুর চড়-লাথি কুসুমের ছোট্ট শরীরটাকে শ্রান্ত করে ফেলেছে।

যে যার কাজে ব্যস্ত। হাসছে, খাচ্ছে, গল্প করছে। কুসুমের দিকে কেউ তাকিয়েও দেখল না।

এ পাড়ার নিয়ম এরকমই। কালুর কেনা মেয়েকে কালু ইচ্ছে করলে খুন করে ফেলতে পারে। তাতে কারো কিছু বলবার এখতিয়ার নেই।

সরু একচিলতে রোদ ভাঙা দেওয়ালে রুগ্□ণ আলো ফেলছে। শান্তি হেলে-দুলে কুয়োর ধারে গেল। মাসি দু'কলসি পানি দিয়ে গেছে। শান্তি এখন অনেকক্ষণ ধরে গোসল করবে। কুসুম আড় চোখে তাকিয়ে দেখল শান্তির হাতে লাল সালুর পেটিকোট, ধোয়া শাড়ি আর গামছা। চুলের বিনুনি খুলতে খুলতে রঙিন সাবানদানিটা ইটের উপর রেখে শান্তি গান ধরেছে। শরীরের কাপড় আলগা করছে। একটু ফরসা রঙের শান্তির বুকের উপরে একটা গোল পোড়া দাগ। দাগটার ইতিহাস এ বাড়ির সবাই জানে। একবার এক শাঁসালো খরিদ্দার জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরেছিল শান্তির বুকের ওপর। রাগ করে নয়, আদরের উগ্রতায়। শান্তি হাঁটুর ওপর পেটিকোট তুলে সাবান ঘষছে। কুসুম চোখ ফিরিয়ে নিল। গলি দিয়ে লোক চলাফেরা করছে। এই সকালেও অনেকের খরিদ্দার আসে। তৃষিত চোখে গলির মুখটার দিকে তাকাল কুসুম। এমনো তো হতে পারে এই সময়ে তার একজন চমৎকার

খরিদ্দার এসে যেতে পারে।

শান্তি মুখে সাবান ঘষতে ঘষতে চেঁচিয়ে ডাকল — ও লো কুসুম! এহানে আয়তো। আমার পিঠ্□টায় এট্□টু সাবান ডইলা দে।

কুসুম মুখ বাঁকাল — ইস। আমি বলে খিদায় মরতে আছি। অহন তোমার পিঠ ডলুম।

শান্তি অকারণে হি হি করে হাসল — ইস রে! তেজ কত! আয় আয়, একখান ডাইলপুরি আছে, দিমুনে তরে।

ডালপুরির আশ্বাসে কুসুম উঠল। শান্তির কাছে এলো। শান্তির বয়স কুড়ি, আর শরীরটা সিনেমার নর্তকির মতো। শান্তির সুডৌল পিঠে ঝিঙের খোলে সাবান মাখিয়ে ঘষে দিতে দিতে কুসুমের রাগ হলো। শান্তির এই শৌখিন স্নানটাকে সে সহ্য করতে পারে না। অনেকক্ষণ ধরে গোসল করে শান্তি। দু'কলসি পানি সে একটু একটু করে আয়েশি ভঙ্গিতে শরীরে ঢালে। মান্নানের দোকানের ক্যালেন্ডারের ছবির মতো শান্তির গোসলেও চটক আছে। পুরো শরীরটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানাভাবে সবার সামনে দেখায়। যেন ভাবখানা — 'দেখ এমন গতর এ বাড়িতে কজনের আছে? আর কজনই বা রোজ কেনা পয়সার পানিতে সাবান মেখে গোসল করতে পারে!'

পিঠ ঘষা হলে ভেজা পেটিকোট সরিয়ে ঊরু মেলে ধরল শান্তি — আমি ডলি। তুই পানি ঢাল্।

ওদিকে বাবুর সঙ্গে মাসির কী নিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়া বেধে গেছে।

বকুল দরজার পাল্লায় পিঠ ঠেকিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে শান্তিকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল — উঠলো মাগি। আর কত গতর দেহাবি?

শান্তি জবাব না দিয়ে হি হি করে হাসল। তারপর ওর ঘরের দরজায় চোখ বুলিয়ে বলল — এত ডর ক্যান? তর ঘরের মানুষ এহানে আইব না। তুই তো ভালা খেইল জানস।

শান্তির কথায় কুসুমও হাসল মুখ ফিরিয়ে। কথাটার অর্থ সেও জানে। বকুল এখন গোসল করবে না। বেলা বারোটা বাজলে সে দু'বালতি পানি নিয়ে ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠবে। খোলা ছাদ থেকে রাস্তার ওপারের গেরস্থবাড়ি, রাস্তার ধারের দোকানপাট, লোকজন, সবই দেখা যায়। বকুলকে তখন সবাই দেখতে পায়। সেই কার্নিশ-ভাঙা ছাদে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে নানা আকর্ষণীয় কায়দায় স্নান সারতে থাকে বকুল। ওই বিজ্ঞাপনী

স্নানই বকুলের কপাল ফিরিয়েছে। এখন ও দামি সিগারেট খায়। প্রতি সপ্তাহে সিনেমা দেখে। বাছাই খরিদ্দার নেয়। তবু ছাদে গোসলের অভ্যাসটা এখনো ওর যায়নি।

শান্তি গোসল সেরে গামছা টেনে নিল। দৃষ্টি ওর বাঁকা হয়ে আছে বকুলের ঘরের দরজায়। বকুলের মানুষ এখনি বেরোবে। কোন অফিসে যেন চাকরি করে। শান্তির দৃষ্টি অনুসরণ করে কুসুমও তাকাল। বকুলের ঘরের দরজা খুলে গেছে। বকুলের পেছন পেছনেই ওর মানুষ বেরিয়ে এলো। শান্তি সঙ্গে সঙ্গে বুকের ওপর থেকে গামছা সরিয়ে ফেলে হাঁটুর ওপর ভেজা পেটিকোটের ঝুল তুলে উঁচু গলায় গান ধরল —

আইস নাগর
বইস নাগর
ফির□্যা ক্যানে যাও ...
নাঙের বুঝি
হইছে গোসা
বাজার বড় ভাও ...

বকুলের মানুষ একটু থমকাল। খোলা চোখে তাকাল শান্তির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে শান্তি রসিক ইশারা ছুড়ল একটা। মুহূর্তে ঘটে গেল কাণ্ডটা। রসিক নাগরকে এক ধাক্কায় দরজায় ঠেলে দিয়ে বকুল যেন উড়ে এসে পড়ল শান্তির ওপর। কুসুম সভয়ে সরে দাঁড়াল। শান্তির শৌখিন সাবানদানি, শুকনো কাপড় বকুল ছুড়ে ফেলল ড্রেনে। তারপর কিল-চড়-লাথির সঙ্গে চিৎকার করে গালি ছুড়তে লাগল। শান্তি এতটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। পলকেই সামলে নিল সে। তারপর আক্রমণ করল বকুলকে। শক্তি তার শরীরেও কম নয়। হুড়োহুড়ি-মারামারিতে সবাই এসে ভিড় জমাল চারিদিকে। ততক্ষণে শান্তির পানির কলসি দুটোই ভেঙেছে। বকুলের ঠোঁটের পাশ চিরে রক্ত পড়ছে। কপাল ফুলে উঠেছে। বড় মাসি ওপরতলার ঘর থেকে নেমে এলো — আ-লো। এই বিহানে দুইটা শুরু করল কী? ছাড় ছাড়। দেহ দেহি কারবার।

কেউ কাউকে ছাড়বে না। মাসিই ছাড়িয়ে দিল। শান্তি ড্রেনের ময়লা থেকে সাবানদানি আর কাদামাখা কাপড় তুলে গাল দিতে দিতে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। বকুল বাইরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ফুঁসল। এত হৈচৈ হট্টগোলের মধ্যে তার মানুষটি কখন কেটে

পড়েছে কেউ খেয়াল করেনি। খালিঘরে গিয়ে দড়াম করে দরজা লাগাল বকুল। বন্ধঘর থেকেই স্বর উচ্চগ্রামে তুলে শান্তিকে শাসাতে লাগল।

কুসুম পায় পায় এলো ঘরে। শান্তি গজগজ করতে করতে গামছা দিয়ে শরীরের কাদা ঘষে তুলছে। কুসুমকে দেখে বলল — যা দেহি ওই ঘরের বাবুরে ক বাজার থেইকা ঠিল্লা কিনা দিব। আর ওই হারামির দেমাগ যদি আমি না ভাঙছি তো আমার নাম শান্তি না।

খিদেটা আবার পেটের মধ্যে পাক দিচ্ছে। কুসুম লোভী চোখে তাকিয়ে দেখল ঘরের একধারে থালায় একটা ডালপুরি পড়ে আছে। দড়ির ওপর থেকে শুকনো কাপড় টেনে নামিয়ে শান্তি ঝামটা দিল — হাঁ কইরা খাড়াইয়া রইলি ক্যান? যা বাবুরে ডাক দিয়া আন।

কুসুম মিনমিন করল — আমারে ডাইলপুরি দিলা না?

শান্তি রাগিমুখে ফিরল। থালা থেকে ডালপুরিটা তুলে কুসুমের দিকে ছুড়ে দিল — নে খা।

ডালপুরি লুফে নিল কুসুম। একবারে দলা পাকিয়ে মুখে পুরে দিল। জরিনা বাইরে গিয়েছিল। হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল — কী লো শান্তি! আইজ বলে খুব দিছস দেমাগিরে?

শান্তি হাসল না। বেড়ায় গোঁজা সিগারেটের প্যাকেট নামিয়ে সিগারেট বের করল — দিমু না! ট্যাকার গরমে চক্ষে আন্ধার দ্যাহে। এই বাড়িতে থাইক্যা এত গরম কিয়ের? সব মরদগো ইজারা লইয়া বইছে নাকি ও? জরিনা হেসে গড়িয়ে পড়ল। শান্তি ভুরু কুঁচকাল — অত হিটকাইস না। আমার ভালো লাগে না।

কুসুম ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

সরু গলি ধরে দক্ষিণে চলে এলো। এদিকের ঘরগুলো যেন এখুনি হুমড়ি খেয়ে পড়বে। এই দিনের বেলাও এদিকটা অন্ধকার। সূর্যের আলো ভুল করেও এখানে ঢোকে না। গলির অন্ধকার ফুঁড়েই পাগলি রহিমন বেরিয়ে এলো। ওকে একটা কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। বুক-পিঠ সমান। ডানদিকের গালের পাশে একটা ফুটো। নাকটা খসে গেছে খারাপ ব্যামোতে। সামনে দুটো দাঁত নেই। কার কাছে কবে প্রচণ্ড মার খেয়ে দাঁত দুটো খুইয়েছে। চোখের নিচে মাংসপেশি অস্বাভাবিক ফোলা। কত মাস গোসল করে না কে জানে। কপাল কুঁচকে চোখ পিটপিট করে কুসুমকে দেখল রহিমন — ও কুসমি, তুই কই যাস?

কুসুম রহিমনের পাশ কাটিয়ে বলল — বাবুরে ডাকবার যাই। শান্তি বুজি বোলাইছে।

রহিমন অকারণে হেসে উঠল — শান্তির অহন খুব কদর না রে! জানছনি একদিন আমারও খুব কদর আছিল। একবার এক ঠিকাদার, বুঝলি খুব পয়সাওয়ালা, আমারে সোনার চেন আর কানের দুল দিছিল, কত খাতির করছে আমারে।

রহিমনের কণ্ঠটা ক্রমে হিশহিশে হয়ে উঠেছে — তা বুঝলা কুসুম বিবিজান! এই পাড়ায় খাতির লইয়া কারো দিন যায় না। বুঝলিনি হারামির বাচ্চা খানকির ঝি!

কুসুম দাঁড়াল না। জানে রহিমন এখন ওকে ধরে আবোল-তাবোল বকবে। ওর বিগত সুদিনের গল্প শোনাবে। লোক পেলেই ও ধরে-ধরে ওর সেই সব সুখের খাতিরের দিনের কাহিনি শুরু করে। এখন ওর ব্যবসা নেই। খারাপ ব্যামোয় খসে যাওয়া নাকের বিশ্রী কুৎসিত ক্ষত দিয়ে রস ঝরে। ভিক্ষে করে খায়। সন্ধ্যার পর গলির মুখটায় বসে থাকে। যত লোক আসে সবার কাছে হাত পাতে। সবাই জানে ভিক্ষে করা পয়সায় বেশিরভাগ দিন ভাত-রুটি কেনে না ও। তাড়ি কিনে খায়। নেশা করলে ওর পাগলামি বাড়ে। দুনিয়াসুদ্ধ লোকের ইজ্জতহানির গালাগালি শুরু করে।

কুসুম দু'পা এগোতে রহিমন খপ করে কুসুমের একটা হাত চেপে ধরল। কণ্ঠস্বর নিচু করে বলল — দুইটা ট্যাকা হাওলাত দিবি?

ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল কুসুম — কই পামু ট্যাকা! আর তরে কে হাওলাত দেয়!

রহিমন গাল দিয়ে উঠল — ক্যান লো মাগি! শান্তির ঘরে থাকস দুই-চাইরডা ট্যাকা সরাইবার পারছ না? জানছনি আমার যহন ট্যাকা আছিল কত লোকেরে হাওলাত দিছি।

কুসুম আর দাঁড়াল না। রহিমনের ময়লা দুর্গন্ধ ওঠা শরীরের পাশে দাঁড়িয়ে ওর বুকের পাঁজর আর নাকের বিশ্রী ফুটো দেখতে তার ভালো লাগছে না। কুসুম জানে রহিমন এখন এ দরজায়, ও দরজায় ঘুরবে। কিছু পয়সা পেলেই গলির ছেরুর দোকানে তাড়ি খাবে। তারপর ড্রেনের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে ঘুমোবে। ওর নাকের ক্ষতটা আর হাঁ-করা মুখের ওপর মাছি উড়বে। পথ দিয়ে যাবার সময় কেউ হয়তো লাথি মেরে ওর নেশায় অচেতন দেহটা ড্রেনের দিকে সরিয়ে দিয়ে গালি ছুড়বে।

গলির মোড় ঘুরতেই দেখল পিরু আর পারুল ভাঙা সিমেন্টের ওপর ইটের টুকরো দিয়ে গুটি খেলছে। কুসুমকে দেখে পারুল ডাকল — ওই কুসমি? খেলবি নি আয়।

পিরু কুসুমের চেয়েও বয়সে ছোট। পারুল আর কুসুম প্রায় সমবয়সী। পিরু এসেছে এখনো ছ'মাস হয়নি। হীরু সর্দারের কাছে ও পঁচিশ টাকায় বিক্রি হয়েছিল। পারুল এসেছে দুর্ভিক্ষের সময়। পিরু তো কদিন আগে পর্যন্ত কুয়োর পাড়ে বসে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদত। মা-বাবা, ভাই-বোনের কথা বলত। এখন আর কাঁদে না। সন্ধ্যার পর সবার সঙ্গে গলিতে দাঁড়ায়।

কুসুম একটু দাঁড়াল — ওই! আইজ কী হইছে শোনছস?

হাত দিয়ে গুটি লুফতে লুফতে পিরু প্রশ্ন করল — কী হইছে?

কুসুম চোখ মটকে হাসল — শান্তি বুজি আইজ খুব দিছে বকুল বুজিরে।

গুটি নামিয়ে পিরু-পারুল দু'জনেই উৎসাহে তাকাল। পারুল বলল — ক্যান লো! কী হইছে?

কুসুম ঠোঁটে মোচড় দিল — বকুল বুজির মানুষ হাঁ কইরা শান্তি বুজির গতর দেখছে। আর বকুল বুজি রাইগা আইয়া হামলাইয়া পড়ছে শান্তি বুজির উপরে। আইচ্ছা তরাই ক কার দোষ?

পিরু হাত দিয়ে গুটি তুলে ঠোঁট উল্টাল — কী জানি কার দোষ! বকুল বুজি একদিন আমারে তেহরি খাওয়াইছে। বকুল বুজি খুব ভালো।

পারুল ঘাড় বাঁকা করল — তাই কী হইছে! শান্তি বুজিও তো একদিন আমারে একটা ট্যাকা দিছে।

পারুল হঠাৎ চেহারা পাল্টে ফেলল। অভিজ্ঞ ভঙ্গিতে ভ্রূ নাচাল — জানস কুসুম! কাইল আমি পাঁচজন মানুষ বহাইছি। একজন কইছে আমারে সিনেমা দেহাইব।

পিরু বিষণ্ন মুখে শেওলা-ধরা শানে ইটের টুকরো দিয়ে দাগ কাটল — আমার খুব কষ্ট হয় মানুষ বহাইতে। কী করুম! মাসি যে মারে! ভাত পাই না। তরা দেহিস একদিন আমি পলাইয়া যামু।

পারুল ভেংচি কাটল — ইঃ! পলাইব। অত সোজা! তার আগে হীরু তর প্যাট ফাইড়া কুয়ায় ফালাইব।

পিরুর চোখ ছলছল করে উঠল। হঠাৎ বলল — কুসুম তুই লঞ্চে চড়ছস?

কুসুম দূরের কোনো স্মৃতির দিকে তাকিয়ে হাসল — একবার চড়ছি। দ্যাশে থিকা লঞ্চে

উইঠা ঢাকা আইছিলাম।

পিরুর চোখে উৎসাহ ফুটল — গাঙে নাইতে কত মজা না রে? আর ধান টোকাইতে?

সিঁড়ি দিয়ে মাসি নেমে এলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনজনই আড়ষ্ট হয়ে গেল। পিরুর মুখটাই বেশি ফ্যাকাসে। মাসি পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় বলল — ওই পারুল, এট্□টু পরে আমার ঘরে আহিস তো।

কুসুমের এতক্ষণে মনে পড়ল সে বাবুর খোঁজে বেরিয়েছিল। শান্তির ফরমাশ খাটলে তার লাভ ছাড়া লোকসান হয় না। পারুল জিজ্ঞাসা করল — ওই বাবুরে দেখছস?

পারুল উঠে দাঁড়িয়ে রুক্ষ চুল আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলল — বাবুতো কখন বাজারে গ্যাছে গা।

কুসুম ফিরল। সবগুলো ঘরের এখন দরজা খোলা। এখানে-ওখানে জটলা করছে সবাই, ভাঙা সিঁড়ির ওপর পা ছড়িয়ে বসে একটু বেশি বয়সী মেয়েরা গল্প করছে, উকুন বাছছে। কুসুম সোজা ফুলমতীর ঘরে এলো।

ফুলমতী মাটির গামলায় কুয়োর পানি নিয়ে বাচ্চার কাঁথা-কাপড় ধুতে বসেছে। ওর ঘরটাকে ঘর না বললেই চলে। ইটের নোনা-ধরা দেওয়াল ঘেঁষে দু'খানা দরমার বেড়া আর ওপরে একটু টিন খাড়া করে ঘরটা তৈরি হয়েছে। মেঝেটা কাঁচা। আগে ও এর চাইতে একটু ভালো ঘরেই থাকত। বাচ্চাটা হবার পর ফুলমতীর খরিদ্দার একেবারে কমে গেছে। কিছুদিন থেকে আবার দু'একজন খরিদ্দার আসছে। খরিদ্দার এলে ফুলমতী বাচ্চাটাকে কাঁথায় মুড়ে ওদিকের ঘরে সখিনার নানির কাছে রেখে আসে। কুসুমকে ডাকল ফুলমতী — ও কুসুম! গ্যাদাডারে এট্□টু ধরবি। আমি ত্যানা কয়ডা এট্□টু ধুইয়া লইতাম।

ফুলমতীর বাচ্চা ভেজা মাটিতে ছেঁড়া চাটাইর ওপর পড়ে চেঁচাচ্ছে। কুসুম বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল। কোলে নিয়েই চমকে উঠল — ও বু, তোমার গ্যাদার দেহি গতর গরম! জ্বর আইছে নি?

অল্প পানিতে কাঁথা-কাপড়গুলো ভিজিয়ে তুলতে তুলতে ম্লানমুখে ফুলমতী তাকাল। বিষণ্নকণ্ঠে বলল — হ। ঠাণ্ডি করছে। কাইল সারাডা রাইত কানছে। বুকে একটু ত্যাল মালিশ করলে ভালো হইত। সইর্ষার ত্যাল পামু কই। আইজ বিকালে দেহি যামু ডাক্তারের কাছে।

কাঁথা চিপড়ে দড়িতে মেলে ফুলমতী ফিরল। বলল — হোমিপথিক গুল্□লি কিনতেও তো চাইরডা ট্যাকা লাগে। কী করি ক দেহি?

কুসুম অভিজ্ঞ মানুষের মতো কথা বলল — কয়ডা মানুষ বহাইবার পারলেই তো বাচ্চাডার ওষুধ কিনবার পয়সা হইয়া যায়।

ফুলমতী জবাব দিল না। বুকের আঁচল সরিয়ে বাচ্চার মুখে দুধ দিল। কুসুমের যেন শরীরটার মধ্যে কেমন করে উঠল। দূর-ঝাপসা একটা স্মৃতি... কোথায় যেন পড়ে আছে মনের কোণে। এমনি করে, ঠিক এমনি ভঙ্গিতে মা তার ছোট ভাইটার মুখে দুধ তুলে দিত। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল। ফুলমতীর রোগা টিকটিকির মতো বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে ভাবল, না, না, সে যেন কোনোদিন মা না হয়। এ বাড়িতে বাচ্চার মা হওয়া কী ভয়াবহ অপরাধ তা সবার মতো কুসুমও জানে।

সকালের পাট চুকিয়ে অনেকেই চুলো ধরিয়েছে। চার হাত আট হাতি ঘরে সবারই আলাদা সংসার। নড়বড়ে তক্তপোষের তলায় কালি ধরা বাঁকা-ট্যারা এনামেলের হাঁড়ি, হাতল-ভাঙা কড়াই, ভাতের সানকি, চটা ওঠা টিনের বাটির সঙ্গে মসলাপাতি, তেলের টিন, লবণের কৌটা ঠাসাঠাসি করে ভরা। কারো কেরোসিনের চুলো। কারো বা মাটির উঠো-চুলো। ঠিকে মাসি বাজার এনে ঘরে ঘরে নামিয়ে দিয়েছে। কারো একটা রোগা কুমড়োর ফালি, অথবা পানি চোপসান বেগুন, ঝিঙে। কারো আছে চুনোপুঁটির একভাগ। বাবু অবশ্য অনেকের জন্য ঠাঁটারীবাজারের চর্বিদার খাসির মাংস আর ইলিশ মাছ এনেছে।

জাহানআরা অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে উঠেছে। জাহানআরার ঘরটা শৌখিনই বলতে হবে। জাহানআরা নিজেও শৌখিন। আর শৌখিন হবে না-ই বা কেন! তার মতো এমন নিটোল সুন্দর শরীর এ পাড়ায় কজনের আছে! শুধু এ পাড়ায় কেন, এরকম আরো দুটো পাড়ায় কোন মেয়ের আছে এমন নেশাল শরীর! তাছাড়া যেসব মেয়ে লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসায় নেমেছে তারা কেউই জাহানআরার পায়ের যোগ্য নয়। জাহানআরা ইচ্ছে করলে এখুনি সিনেমার নায়িকা হয়ে যেতে পারে। সে থাকে দোতলার সিঁড়ির মুখটার সামনের ঘরে। ঘরটার দেয়ালের চুন-সুরকি ঝরে গেলেও পুরোনো ছাল-ওঠা মেঝেটা পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে। দু'বেলাই ঘর মোছায় সে। ঠিকে ঝি আছে তার। ঘর মোছে। কাপড় ধোয়। গোসলের পানি তুলে দেয়। জাহানআরা নিজে রান্না করে না। তিনবেলাই হোটেল থেকে

খাবার আসে তার।

জাহানআরার ঘুম ভেঙেছে কিছুটা আগে। বিছানায় শুয়ে চারটে সিগারেট পুড়িয়েছে এতক্ষণে। আধহাত দৈর্ঘ্যের গরাদ-ভাঙা জানালা দিয়ে পাশের বাড়ির দেওয়ালে রোদের বিস্তৃতি দেখতে দেখতে আয়েশ করছে। জাহানআরার ঘরের দেওয়ালে বিরাট একটি নগ্ন নারীর ছবি। পেছনে নীল সমুদ্রের ছায়া। জাহানআরা কোনোদিন সমুদ্র দেখেনি। ছবিটা যে এনে দিয়েছে সেই বলেছে ওটা সমুদ্র। জাহানআরা অবসর সময়ে অনেক ভেবেছে আসল সমুদ্রের চেহারা সম্পর্কে। মনে আসেনি। কেবল গরাদ-ভাঙা জানালা দিয়ে দেখা পাশের বাড়ির নোনাধরা হতচ্ছাড়া চেহারার দেওয়াল আর ছাদের আলসের ওপর দিয়ে রোগা একটুকরো আকাশই ঘুরেফিরে এসেছে মনের দৃষ্টিতে। তার চেয়ে ছবির বিশাল শরীরের মেয়েটাকে তার অনেক চেনা মনে হয়। আবার হাসিও পায়। ছবির সঙ্গে শরীর নিয়ে মনে মনে সে একটা প্রতিযোগিতায় নামে।

বিছানা ছেড়ে উঠল জাহানআরা। দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে রাখা মদের বোতলটা নামিয়ে রাখল চৌকির তলায়। নিজেই শৌখিন নকশাদার চাদর টেনে বিছানা ঠিক করল। ঠিকে মাসি সকালের পানি দিয়ে গেছে দরজার সামনে বালতিতে। হাতমুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকে দরজা ভিড়িয়ে দিল জাহানআরা। নিচে থেকে চেঁচামেচি, হৈচৈ, ঝগড়ার শব্দ ভেসে আসছে।

দরজা ঠেলে ভেতরে এলো ময়না। মধ্যবয়সী ময়না জাহানআরার জন্য পারাটা আর মাংস নিয়ে এসেছে হোটেল থেকে। নাশ্□তার প্লেট-বাটি টুলের ওপরে নামিয়ে রেখে ময়না বলল — বু কেটলিটা দেও। তুমি খাইতে খাইতে আমি চা লইয়া আহি।

ঘরের কোণ থেকে নিজেই কেটলি তুলে নিয়ে ময়না চলে গেল।

ময়না এখন দেহের ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে। গলির ভেতর সন্ধ্যার পর দোকান সাজিয়ে বসে সে। উঠো-চুলায় পেঁয়াজি, বেগুনি, বুট ভুনা, ডিমের চটপটি তৈরি করে বেচে। দিনে জাহানআরার ঠিকে ঝিয়ের কাজ করে। জাহানআরার হাত দরাজ। তাছাড়া ময়নার ওপর তার পক্ষপাতিত্ব আছে। মাঝে মাঝে বড়দরের খরিদ্দারদের কেনা বিলেতি মদের এক-আধটু ময়নাকে দান করে সে। সময়ে সময়ে মায়না ছাড়াও টাকাটা সিকিটা হাতে তুলে দেয়। কিছুদিন আগে একটা নাইলনের শাড়ি দিয়েছে। অবশ্য আর একটা কারণ আছে ময়নাকে খাতির করার। জাহানআরার মাঝে মাঝে বিশ্রী ভয়ংকর মাথা ধরে। মাথাধরা

রোগে এ বাড়ির সব মেয়েই কমবেশি ভোগে। মান্নানের দোকান থেকে কোডোপাইরিন ট্যাবলেট কিনে খায়। কিন্তু জাহানআরার ব্যাপারটা অন্যরকম। একটু অভিজাত অভ্যাসের জাহানআরা তখন একদম অন্যরকম হয়ে যায়। চিৎকার করে বালিশ-কাঁথা ছুড়ে ফেলে, বোতল আছড়ে ভাঙে। অশ্লীল গালাগাল করতে থাকে পৃথিবীসুদ্ধ সবাইকে। কেউ তখন জাহানআরার সামনে যেতে পারে না। সবাইকে তেড়ে মারতে আসে সে। দেয়ালে মাথা কুটে কপাল ফুলিয়ে ফেলে। তখন ময়নাই এগিয়ে আসে। জাহানআরাকে জাপটে ধরে বিছানায় শুইয়ে দেয়। ময়নাকে আঁচড়ে, কামড়ে, লাথি মেরে বিপর্যস্ত করে ফেলে জাহানআরা। গালি দিতে থাকে — খানকিরা তরা দূর হইয়া যা। সবটির শরীরে মরিচ বাটা দিমু আমি। আগুন দিমু এই বাড়িতে।

মার খেয়ে দমে না ময়না। জাহানআরার মুখ চেপে দুটো সোনারিল ট্যাবলেট পানি দিয়ে ঢেলে দেয় মুখে। বিছানায় গড়াগড়ি করে জাহানআরার ছটফটানি কমে আসে। গালির তোড়ে ভাটা পড়ে। ময়না তখন আস্তে আস্তে ওর বুকের বাঁধন আলগা করে দেয়। পেটিকোটের ফিতা ঢিলে করে দিয়ে মমতাভরা কণ্ঠে বলে — ঠিক হইয়া যাইব। সব ঠিক হইয়া যাইব। দেইখ একদিন একটা পয়সাওয়ালা বাবু তোমারে বিয়া কইরা ঘরে নিব। পোলাপান হইব। সুখের সংসার হইব।

জাহানআরা নির্বাক নেশাল চোখে ময়নার গুনগুন শব্দের কথাগুলো শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। ময়নার হাতটা ঘুমের মধ্যেও আঁকড়ে ধরে থাকে। জাহানআরা ভুলে যায় একবার এরকম যন্ত্রণার সময় ময়নার কপালে একটা বোতল ছুড়ে মেরেছিল সে। ময়নার কপালের কাটা ঘা শুকোতে বেশ সময় লেগেছিল। জাহানআরার এখন কাল রাতের কথা মনে পড়ল। কাল রাতে তার একজন অদ্ভুত খদ্দের এসেছিল। লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকদের মতো। অবশ্য জাহানআরার বেশিরভাগ খদ্দেরই ভদ্রলোক এবং লেখাপড়া জানা। জাহানআরা আজকাল নিজে গলিতে দাঁড়ায় না। কাঞ্চন আর ময়না তার খদ্দের নিয়ে আসে। কালকের লোকটা আগে কোনোদিন জাহানআরার ঘরে আসেনি। ময়না রেট ঠিক করে জাহানআরাকে খবর দিয়ে গেছে। জাহানআরা শুধু প্রশ্ন করেছে — কেমন মানুষ? মালের জোর আছে তো?

ময়না হেসেছে — আরে বুজি, তোমার খোশবাই শহর ভইরা ছাইয়া গেছে। কদরটাও

লোকে জানে। যেইসেই মানুষ কি আর এই দরজায় ঢুকবার পারে। আগাম বখশিশ দিছে আমারে।

লোকটাকে দরজায় পৌঁছে দিয়ে ময়না চলে গিয়েছিল। তার দাঁড়াবার সময় নেই। দোকানে বিক্রির সময় এটা। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা লোকটা ঘরে ঢুকে প্রথমে ছবির দিকে তাকিয়েছিল। জাহানআরার দৃষ্টি তখন লোকটাকে জরিপ করছে। এখন সে লোক দেখলেই বুঝতে পারে এ পাড়ায় নতুন না পুরোনো। নতুন লোকগুলোর মধ্যে কেমন একটু ভীতু ভীতু লাজুক ভাব থাকে। পরে কিন্তু কাজ আদায়ের সময় তারা পয়সা উসুলের বেশি আবদার ধরে। জাহানআরা আজকাল বাড়তি আবদারে পাত্তা দেয় না। বরং ওদের নিয়ে একটু মজা দেখতেই তার ভালো লাগে। কিন্তু কালকের লোকটার ব্যবহার ছিল একেবারে অন্যরকম। দেওয়ালের বিদেশিনীর নিরাবরণ ছবিটা নিঃসংকোচে দেখছিল সে। তার চোখে-মুখে কোনো ক্ষুধার্ত পুরুষের অস্থিরতা ছিল না। বরং ছবিটা কিছুক্ষণ কৌতুকের দৃষ্টিতে দেখে দেওয়ালে টাঙান জাহানআরার বিভিন্ন ভঙ্গিমার ফটোগ্রাফগুলোতে চোখ বুলিয়ে সরাসরি তাকিয়েছিল জাহানআরার দিকে — তুমি জাহানআরা?

জাহানআরা একটু ঝাঁঝাল উত্তর দিয়েছিল — ক্যান ঘর ভুল হইছে নাকি?

— না, তোমার অনেক নাম শুনেছি।

জাহানআরা ব্যবসাদারী চটুল হাসি হেসে উঠেছিল — অহন মানুষডারে দেখবার আইছ? জানো, আমি কত ট্যাকা নেই?

— জানি, পঞ্চাশ টাকা।

পকেট থেকে ব্যাগ বের করে একটা লালচে পঞ্চাশ টাকার নোট ছুড়ে দিয়েছিল সে জাহানআরার দিকে।

জাহানআরার কেমন রাগ হয়েছিল। তবু হিসেবি সতর্কতায় টাকাটা তুলে নিয়ে বলেছিল — বহেন।

লোকটা জাহানআরার কথা যেন শুনতেই পেল না। ঘুরে ঘুরে জাহানআরার ঘর দেখল। হঠাৎ বলল — তোমার দেশ কোথায়?

জাহানআরা রেগে গেল — অত প্যাঁচাল পাড়নের সময় নাই আমার। যে কামে আইছ হেই কাম সাইরা যাও গা। আমার আরো কাস্টমার আইব।

লোকটা নির্বিকার। জাহানআরার বিছানায় বসে সিগারেট ধরাল। হঠাৎ কী মনে করে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিল জাহানআরার দিকে। নির্দ্বিধায় সিগারেট ধরিয়ে লোকটার পাশে বসল জাহানআরা। লোকটার নিরাসক্তিতে ভেতরে ভেতরে একটা রাগ চাড়া দিচ্ছে তার। কমজোর পুরুষ নয় তো? অনেক কমজোর পুরুষ আছে যারা এসে সুপুষ্ট নারীদেহ দেখেই উত্তেজনার অবসান ঘটায়। তাতে এ পাড়ার মেয়েদের কিছুই আসে যায় না। পয়সাটা ঠিকমতো পেলেই হলো। পরদিন নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে। কেউ হয়তো লোকটা বেরিয়ে যাবার সময় নিচুকণ্ঠে হাসি চেপে বলে — ছেরুর দোকানে হিজড়ার নাচ দেখাও গা। মাইয়া মানুষের ধারে আইছ ক্যান?

জাহানআরার ঊরুর উত্তপ্ত চাপ লাগছে লোকটার ঊরুতে। সন্ধ্যার পর জাহানআরা পেটিকোট ছাড়া পাতলা শাড়ি পরে। ব্লাউজ পরে না। শহরের বড় দোকান থেকে কেনা শার্টিনের ব্রেসিয়ার পরে।

লোকটা দৃষ্টি ফিরিয়ে জাহানআরাকে দেখল। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে অল্প একটু চাপা হাসল — এসব তোমার খুব ভালো লাগে। তাই না?

জাহানআরা ফোঁস করে ঘুরে দাঁড়াল। সে কি পাড়ার অন্য মেয়েদের মতো হ্যাংলা নাকি, যে টাকা পেলেই বর্তে যাবে! পঞ্চাশ টাকার নোটটা তুলে এনে লোকটার গায় ছুড়ে মেরে বলল — বাইরা হারামখোর। বেশ্যা দেখবার আইছে। ক্যান লো গোলামের পুত, আমরা কি চিড়িয়াখানার জানোয়ার নিহি?

লোকটার মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটল — তুমি খুব তেজি। অবশ্য তোমার অবস্থা ভালো, তাই। তুমি যদি খেতে না পেতে তবে কি টাকাটা ছুড়ে ফেলতে পারতে?

জাহানআরা রাগ ভুলে অবাক হলো। এ কেমন লোক! এ কি খেজুরে আলাপ করবার জন্য বেশ্যার ঘরে এসেছে নাকি? জাহানআরার এমন দামি নেশাল শরীরটাকে সে তাকিয়েও দেখছে না। জাহানআরা এবার তার খেলায় নামল। পুরো শরীরটার চাপ লোকটার শরীরে ঢেলে এক হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল — মাল খাওয়াইবা? আমি আবার বাংলা খাইবার পারি না। বিলাতিই খাই।

লোকটার সিগারেট শেষ হয়েছে। পকেটে হাত দিয়ে টাকা বের করে জাহানআরার দিকে বাড়িয়ে ধরল — আনিয়ে নাও।

জাহানআরা টাকা তুলে নিয়ে বারান্দায় গেল। সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ময়নাকে ডাকল। ময়নার হাতে টাকা দিয়ে এক বোতল বিলাতি মদের হুকুম করে ঘরে ফিরে এলো। লোকটা তখন আগের সিগারেটের অবশিষ্টাংশ পায়ে পিষে নিভিয়ে ফেলে আরেকটা সিগারেট ধরিয়েছে।

জাহানআরার ছুড়ে ফেলা পঞ্চাশ টাকার নোটটা লোকটার পাশে পড়ে আছে। তুলে নেয়নি সে। টাকাটা আবার কুড়িয়ে নিল জাহানআরা। মুখে একটু নরম হাসি ফুটিয়ে বলল — তুমি বুঝি এই পাড়ায় নতুন?

লোকটা অন্যমনস্কভাবে জাহানআরাকে দেখতে দেখতে বলল — হুঁ।

— তোমার বউ আছে?

— না।

— কী কর, ব্যবসা?

— না।

— সিনেমার লোক?

— না।

— ও বুঝছি। ছবি আঁকবার আইছ।

— তাও না।

— তয় বহেন না ক্যান?

লোকটা বিচিত্র হাসল — বিছানায় তো কত লোকই আসে। এত ব্যস্ত হয়েছ কেন?

জাহানআরার আবার রাগ হলো — আমাগো টাইমের দাম আছে।

— সেটা জানি। আচ্ছা জাহানআরা — জাহানআরাই তো তোমার নাম! তুমি কি নিজেকে খুব সুখী মনে কর?

ময়না দরজায় ধাক্কা দিল — ও বুজি তোমার বোতল আনছি।

জাহানআরা উঠে দরজা খুলে বোতলটা নিল। লোকটার দিকে একটু কোনাচে চোখে তাকিয়ে একটা দশ টাকার নোট এগিয়ে দিল ময়নার দিকে — বোতল কি শুধা খামু নিহি? যা শিককাবাব লইয়া আয়। জলদি আবি। তুই না পারলে কাঞ্চনরে দিবি।

এক হাত দিয়ে দরজার পাট ভিড়িয়ে শরীরটায় আকর্ষণীয় ভঙ্গি তুলে হাসল জাহানআরা

— কী গো নাগর। সিনেমার হিরোর নাগাল হাঁ কইরা রইলা ক্যান? খালি বোতল খাইয়াই মন ভরব?

লোকটা সিগারেটের ধোঁয়া ওপরে উড়িয়ে দিয়ে বলল — দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এস।

জাহানআরা এবার মনে মনে হাসল। 'এইবার তাইলে চান্দু আসল কামের কথায় আইছ। শুধা শুধা অমুন ভেল্কি দেহাইতে আছিলা ক্যান?' দরজা বন্ধ করে তাকের ওপর থেকে দুটো বেঁটে কাচের গ্লাস নামিয়ে আনল জাহানআরা।

তাকে একগোছা আগরবাতি জ্বলছে। আগরবাতির নীল সুগন্ধি ধোঁয়া ভাঙাচোরা ঘরটাতে নওয়াবপুরের ঝালাইকরের দোকানের মতো ব্যবসায়ী আভিজাত্য এনেছে। কুলুঙ্গির বোতল থেকে পীরজঙ্গী মাজারের পড়া-পানির ছিটা আরো একটু শরীরে মেখে নিল জাহানআরা। তারপর ফিরে এলো লোকটার কাছে। লোকটা সম্পর্কে সে কৌতূহল বোধ করতে শুরু করেছে। সব জাতের পুরুষই তার দেখা আছে। বুড়িগঙ্গার ধারের পাড়া থেকে এই পর্যন্ত পুরুষ তো কত দেখল। জাহানআরা তাদের কাউকে আলাদা করে ভাবে না। তাদের অবয়ব আলাদা করা যায় না।

লোকটা নিজেই বোতল খুলল। গ্লাসে ঢেলে একটু ইতস্তত করল। বলল — সোডা নেই?

জাহানআরা এবার খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে তার বুকের আঁচল গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। জাহানআরার সুগঠিত বুক, পেট, নাভির উপরিভাগের পেলব মসৃণতায় একপলক চোখ রেখে থমকাল লোকটা — হাসছ কেন?

জাহানআরা আরো হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বলল — এত শখের কায়দায় মদ খাওনের অভ্যাস। তাইলে এই গলিতে আইছ ক্যান মিয়া? শুনছি তোমাগো কেলাবে-হোটেলে সাহেব-ম্যামরা সোডা, বরফ দিয়া মদ খাইয়া গলাগলি ধইরা নাচে। ইয়ার বিবি উয়ার লগে। তার খসম আরেকজনের বিবির লগে। তোমরাই ভালো আছ। তোমাগো বিবিগো কেউ বেশ্যা কইব না। লাইসেন্স লইতে কোট কাচারিতে দৌড়ান লাগব না।

লোকটা দেখল জাহানআরার চোখে কেমন আক্রোশ জ্বলছে। হেসে ফেলল সে — তুমি তো অনেক খবর রাখ।

জাহানআরা হাসি বন্ধ করে ফেলেছে। লোকটার হাত থেকে বোতল ছিনিয়ে নিয়ে

দু'গ্লাসে ঢালল। একটা গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলল — নেও খাও। আর প্যাঁচাল পাইড়া আমার টাইম নষ্ট কইরো না। রাইতে আমার বান্ধা কাস্টমার আইব।

লোকটা গ্লাস তুলে মুখে ছোঁয়াল।

ময়না আবার দরজায় ধাক্কা দিল — কই গো বু! এই যে শিককাবাব ধর।

কাবাবের ঠোঙাটা দরজার ফাঁকে গলিয়ে দিয়ে ময়না চলে গেল। জাহানআরা গ্লাস হাতে নিয়ে কাবাবের ঠোঙাটা তুলে আনল। কালো ব্রেসিয়ার-পরা বুকে সে আর আঁচল তুলে দেয়নি। শাড়ির আঁচল মেঝেতে লুটিয়ে লোকটার শরীরের পাশে আহ্লাদী বেড়ালের মতো জড়িয়ে বসেছে। একটা পা দিয়ে লোকটার পায়ের পাতা ঘষে উত্তপ্ত করছে।

লোকটা এক টুকরো কাবাব তুলে মুখে দিল — আচ্ছা জাহানআরা, বললে না তো তুমি সুখে আছ কিনা?

ভেজা ঠোঁটে হাসল জাহানআরা — সুখেই তো আছি।

জাহানআরার চোখে রঙিন নেশার ছোপ ধরেছে। মুখের রেখার সাবধানি সতর্কতা কমে এসেছে। লোকটা আধগ্লাস মদই একটু একটু করে খাচ্ছে। কোনো তাড়াহুড়ো নেই। যেন জাহানআরার সারা রাতের অতিথি সে। জাহানআরার দিকে তাকিয়ে আবার বলল — কিন্তু একদিন তো তুমি বুড়ো হয়ে যাবে। তোমার রোজগার থাকবে না।

জাহানআরা সোজা হয়ে বসল এক ঝটকায়। মুখিয়ে উঠল কুপিত চোখে — ক্যান লো মাংগির পুত! কামাই কমব ক্যান আমার! জানসনি দুইডা মদের দোকান আছে আমার। আলাদা পট্টি বহাইবার পারি আমি ইচ্ছা করলে। অহনি বিশ-পঁচিশটা মাইয়া রাখবার পারি। ভাত ছিটাইলে কাউয়ার অভাব নাই।

লোকটা স্থির চোখে জাহানআরাকে দেখছে। জাহানআরা আবার গ্লাস ভরে নিল। একহাতে গ্লাস আর একহাতে সহসা লোকটার গলা জড়িয়ে ধরল। কণ্ঠস্বরে চাপা বিদ্রূপভরা সোহাগ ঢালল — তোমার তো ভারি চিন্তা আমারে লইয়া, বিয়া কইরা ঘরে উঠাইবা নি?

লোকটা জাহানআরার প্রশ্ন এড়িয়ে বলল — আচ্ছা জাহানআরা, এমন তো হতে পারে তোমার বিশ্রী নোংরা ব্যামো হয়ে গেল, তখন?

পলকে জাহানআরার জমে ওঠা নেশা ছুটে গেল। রুখে উঠে ঠাস করে একটা চড়

বসাল লোকটার গালে। তারপর কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলল — মাংগির পুত। কাঁথা পুড়ি তর গুষ্ঠির। আলাই-বালাই। হারামির ছাও এক বোতল মদ খাওয়াইয়া তুই আমারে বদদোয়া করবার বইছস।

জাহানআরার চড় খেয়ে লোকটা রেগে উঠল না। তার চোখে কৌতুক। জাহানআরা রাগে-উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে। নেশা আর তার নেই। দুর্বোধ্য লোকটাকে তার এখন রীতিমতো সন্দেহ হচ্ছে। কী মতলব ওর!

জাহানআরার কোনো শত্রু ওকে পাঠায়নি তো! বলা যায় না এ পাড়ার কথা। অসম্ভব কি! ছড়িয়ে পড়া আঁচল কোমরে জড়িয়ে উগ্রমূর্তি ধরল জাহানআরা। দু'হাতে ঠেলে বিছানা থেকে উঠিয়ে দিল লোকটাকে। কলহবিশারদ দেহপসারিণীর মতো বকতে থাকল — বাইরা ব্যাটা মাইগ্গা আমার ঘরথন। অহনি বাইরা। না বাইরাইলে কাঞ্চনেরে দিয়া তর প্যাটে ছুরি পিনাইয়া দিমু।

নির্বিকার লোকটা জাহানআরার উগ্ররাগের ঝাপটায় একটু হকচকিয়ে গেল। তারপর স্যান্ডেলে পা ঢুকিয়ে ঠাণ্ডা গলাতেই বলল — আচ্ছা যাচ্ছি। আবার আসব জাহানআরা।

লোকটা সত্যি বেরিয়ে যাচ্ছিল। জাহানআরা পেছন থেকে তার পাঞ্জাবি খামচে ধরল — আবার আবি? ক্যান আবিরে শালা? সাপের নাহাল ঠাণ্ডা রক্তের মানুষরে জাহানআরা ছ্যাপ দেয়।

লোকটা একপলক থামল — পুরুষ মানুষকে তুমি কী মনে কর জাহানআরা?

হাত আলগা করে পাঞ্জাবি ছেড়ে দিল জাহানআরা। থুথু ফেলল মেঝেতে — কুত্তা মনে করি। কুত্তা। বুঝছস কুত্তার জাত! যা, এইবার বিদায় হ।

লোকটাকে একরকম ঠেলে বের করে দিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল জাহানআরা। সত্যি বলতে কি, ব্যবসার শুরুতে লোকটা যেন এক কলসি ঠাণ্ডা বরফের পানি ঢেলে দিয়ে গিয়েছিল জাহানআরার ঘরে। সারাক্ষণ মনের মধ্যে প্রশ্নের সঙ্গে একটা অপমানবোধ খচখচ করছিল। তার বাঁধা পেয়ারের খরিদ্দার কমবয়সী পুলিশ অফিসার এসেছিল পরে। প্রশ্ন করেছিল — কিরে জানু। কী হইছে তর আইজ? চাঙ্গা ঠেকে না ক্যান?

জাহানআরা সুপটু দোকানির মতো তৎপর হয়ে গিয়েছিল। সারা শরীরে ঢেউ তুলতে

তুলতে মদ খেয়ে হেসেছিল।

— আইজ একটা শিয়াল ঢুইক্যা পড়ছিল জানির ঘরে। দিছি দাবড়ানি।

দৃষ্টি দিয়ে জাহানআরার শরীরটাকে লেহন করতে করতে মাংস চাটা কুকুরের মতো অফিসার সাহেব গলে গিয়ে বলল — তাই নিকি? নতুন না পুরান?

জাহানআরার মনোযোগ দামি খরিদ্দারের দিকে। দুটো লাইসেন্স ছাড়া মদের দোকান তার। এইরকম কাস্টমারের কৃপাদৃষ্টির ফলেই তাকে হাঙ্গামা পোহাতে হয় না। খরিদ্দারের মনোরঞ্জন করতে করতে জাহানআরা ব্যাপারটা উড়িয়ে দিল — দূর দূর। মাইগ্গা মরদ একটা আইছিল। মাজার জোর নাই, আইছে মাইয়া মানুষ কিনবার।

বাঁধা খরিদ্দাররা চলে যাবার পর ময়না আর কাঞ্চনকে ডেকে লোকটা সম্পর্কে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছে জাহানআরা। দু'জনকে সাবধানও করেছে যার-তার সঙ্গে যেন আর চুক্তি না করে। কার মনে কী আছে কে জানে।

ময়না চায়ের কেটলি নিয়ে এলো। কেটলির নলের মুখ থেকে কাগজের ছিপি খুলতে খুলতে বলল — একি বু! অহন তরি নাস্তা লইয়া বইয়া রইছ যে। শরীর খারাপ করছেনি?

কাল রাতের চিন্তা ঝেড়ে জাহানআরা মুহূর্তে দিনের মানুষ হয়ে গেল। গ্লাসে চা ঢেলে ময়না বলল — তুমি নাস্তা খাইয়া লও। আমি ঝাড়ু দিয়া ঘর মুইছা ফালাই। ওদিকে মাসি আইতাছে তোমার কাছে।

পারাটা-গোশ্□ত মুখে দিয়ে জাহানআরা জিজ্ঞাসার ভ্রূ তুলল — ক্যান লো! মাসির কী কাম পড়ল?

ময়না দ্রুতহাতে ঘর ঝাড়ু দিতে দিতে বলল — কী আর! নিত্যিকার কাইজার ফয়সলা। বকুল আর শান্তি মাইরপিট করছে সকালে। অহন আবার শান্তি যাইয়া বকুলের কাপড়লতা সব কুয়ায় ফালাইয়া দিছে।

— ক্যান?

— ক্যান আবার, মানুষ লইয়া কাইজা। কেউ তো কম না। দুইজনেরই উঠতি পয়সার গরম। নিজেরাই ঘর ভাড়া দেয়। কাস্টমারও বাড়তাছে বানের পানির নাহাল।

কোমর থেকে বিড়ির কৌটা বের করে বিড়ি ধরাল ময়না।

জাহানআরা অলসভাবে চা খেতে খেতে গরাদ-ভাঙা জানালা দিয়ে রোগা আকাশে উঠতি

বেলার রোদ দেখল। নিরাসক্তভাবে চোখ না ফিরিয়ে বলল — তার আমি কী করুম।

ময়না একটু তাজ্জব ভঙ্গিতে গালে হাত দিল — এইডা কী কও? তুমি জানবা না এই পাড়ায় কী হইল না হইল!

চায়ের গ্লাস ঠক করে মেঝেতে নামিয়ে রেখে সিগারেট ধরাল জাহানআরা। বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল — হ। তাই কইয়া কে কারে কিল মারল, কে ছ্যাপ দিল সব বিচার-আচারই আমার করণ লাগব। মরার বাড়ির এই সব আমার ভালো লাগে না।

ময়না কালো-ছোপ ধরা দাঁত বের করে হাসল। একটু সরে এলো জাহানআরার কাছে। গলা খাটো করে বলল — ব্যাপারডা তো এহানেই সারবার না। বকুল গেদু গুণ্ডারে বোলাইছে। গেদু ওর পেয়ারের মানুষ। গেদু আইয়া তো শান্তিরে ধইরা এই পিটান। মাসি আর কী করব? মাইর খাইয়া শান্তি ক্ষেইপ্যা কুত্তার নাহাল হইয়া গ্যাছে। কইছে বকুলের ভাত বন্ধ করব। এসিড মারব। কও দেহি এমুন বাদাবাদি থেইকা একটা খুন-খারাবি হইয়া গেলে থানা পুলিশ হইব না?

জাহানআরা পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায় — ময়না ব্যবসা ছাইড়া তুইও উদাইয়া গেছস। খুনখারাবি হইলে হইব। আর এই গোলাপিপট্টিতে খুনের তল্লাশিতে আবার পুলিশ আহে কবে?

ময়না কথাটা মাথা নেড়ে মানল। ঝাঁটা তুলে নিয়ে বলল — না গো বু যা-ই কও, নিজেগো মইধ্যে কাইজা-বিবাদ কইরা কাম কি, সবটিতেই গতর বেচা ভাত খায়। খামখা ঝামেলায় না যাওনই ভালো।

জাহানআরা হাসল। কিছু বলল না। একটু আত্মপ্রসাদও অনুভব করল। জানে একটু পরেই হয়তো বিচার নিয়ে মাসি আসবে। তখন জাহানআরা চুপ করে থাকবে না। বাদী-বিবাদী দু'পক্ষেরই তলব হবে তার ঘরে। জাহানআরা অনেকটা নিরপেক্ষ অভিভাবকের মতো দু'জনকেই ধমকাবে। তারপর বলবে — ভালো হইয়া থাকবি তো ভালো, না হইলে দুইডারেই পাড়াছাড়া করুম।

জাহানআরা যে তা পারে তা জাহানআরা নিজে যেমন জানে তেমনি অন্য সবাইও জানে। জাহানআরাকে এ পাড়ার সবাই মেনে চলে। দুর্ধর্ষ গুণ্ডা, জাঁদরেল লোক সবই জাহানআরার হাতে আছে। তাছাড়া খাতির আছে অনেক হোমরাচোমরা কর্তার সঙ্গে।

সিঁড়ি দিয়ে ব্যস্ত পদক্ষেপে কাঞ্চন উঠে এলো। কাঞ্চনের সারামুখে অসংখ্য দাগ। একটা চোখ নেই। কবে যেন ওর শত্রুপক্ষ ওর একটা চোখ উঠিয়ে নিয়েছিল। গোলমালটা ছিল পাড়ার মেয়েমানুষ নিয়েই। কাঞ্চন এখন দুর্ধর্ষ গুণ্ডার ভূমিকায় নেই। নিজে একটা ছোটখাটো দোকান দিয়েছে। তাছাড়া মেয়ের দালাল হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল — ময়না, জানু উঠছে নিরে ঘুম থিকা?

জাহানআরা উঠে বসল — কিরে কাঞ্চন? কী খবর?

কাঞ্চন হাসিমুখে বলল — খবর আছে। জবর খবর।

ময়না ঝাঁটা ফেলে উঠে দাঁড়াল উৎসুকভাবে। জাহানআরার মুখের ওপর পলকে একটু চিন্তার ছায়া ভেসে গেল। নতুন কী হলো আবার? খবর তো এ পাড়ায় হরহামেশা লেগেই আছে। বকুল আর শান্তির ব্যাপারটা বেশি গড়াল নাকি?

জাহানআরা বলল — ঘরে আয়। ওহানে খাড়াইয়া হিটকাস ক্যান?

কাঞ্চন ঘরে এসে জাহানআরার বিছানায় বসল। জাহানআরা বলল — ময়না দুই কাপ চা লইয়া আয় হৈঠল থন।

ময়না ঝাড়ু রেখে চায়ের কেটলি তুলে নিয়ে একপলক দাঁড়াল। চোখ পাকিয়ে ধমক দিল জাহানআরা — হাঁ কইরা খাড়াইয়া রইলি ক্যান লো বুড়ি? কইলাম চা লইয়া আয়।

অপ্রসন্ন মুখে বেরিয়ে গেল ময়না। দু'জনকে শুনিয়েই গজগজ করতে করতে সিঁড়িতে নামল — ঠ্যাহার সময় ময়না। আর চা খাওনের সময় কাঞ্চন।

জাহানআরা ময়নার কথায় কান পাতল না। জাহানআরার কৃপাদৃষ্টি নিয়ে কাঞ্চনের সঙ্গে ময়নার রেষারেষি আছে জাহানআরা জানে।

কাঞ্চন বলল — সিগারেট দে জানু।

জাহানআরা সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল। কাঞ্চন সিগারেট ধরিয়ে মুখ কুঁচকে হাসল — আইজ তো খুব দামি সিগারেট খাবি রে!

জাহানআরা সরাসরি দৃষ্টি ধরে রাখল কাঞ্চনের মুখে — কথাডা ভাইঙাই ক। অত চাপতাছস ক্যান?

কাঞ্চন একচোখে ইশারা ফুটিয়ে বলল — গুলশানের সাবে খবর দিছে।

জাহানআরা উৎসাহে উঠে বসল —

কোন গাড়ি? নীল গাড়ি না সাদা গাড়ি?

— নীল গাড়ির সাব খবর দিছে। যাওন লাগব।

— কবে?

— আইজ রাইত এগারটায়।

— কোহানে? বড় হৈটলে না বাসায়?

— বাসায়। তয় তার বন্ধুর বাসা মনে হয়। ভাইঙা তো সব কয় না তারা।

— কত ট্যাকা ঠিক করছস?

— কত আবার? যা তুই আগে নিছস।

জাহানআরা তীক্ষ্ণচোখে তাকাল কাঞ্চনের মুখের দিকে — কাঞ্চন! চালাকি করবি না। কমিশন কত রাখছস ক।

কাঞ্চন বেপরোয়াভাবে ঠোঁট উল্টাল — চোখ দেহাবি না জানি। মাইয়া মানুষের কারবার কাঞ্চন নতুন করতাছে না। ইচ্ছা করলে তর জায়গায় বকুলরে উঠাইয়া আনবার পারি।

জাহানআরা মুখের ভঙ্গি পাল্টে ফেলল। কাঞ্চনকে সে হাতেই রাখতে চায়। কাঞ্চন না হলে হোটেলে গিয়ে কে এমন বড় পার্টি ঠিক করে আসত। সব গুণ্ডাকেই তো তার জানা আছে।

পয়সায় কেউ বিশ্বস্ত নয়। কাঞ্চন মেজাজি। তবু মোটামুটি বিশ্বস্ত। তাছাড়া এতদিনে জাহানআরার সঙ্গে ওর একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। অবশ্য এ পাড়ায় স্বার্থের দ্বন্দ্বে বন্ধুত্ব বেশিদিন টেকে না।

ময়না চা নিয়ে এলো। গ্লাস ধুয়ে দু'গ্লাস চা ঢেলে দিয়ে বলল — আমি এট্□টু বাজার থিকা আহি গা। আইয়া ঘর মুইছা, কাপড় ধুইয়া দিমু। পানি দিয়া গেছি। নাইয়া লইও।

ময়না দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যেতে জাহানআরা ডাকল — ও ময়না, ধর সিগারেট খাইয়া যা।

নিজের হাতের জ্বলন্ত সিগারেট ময়নার আঙুলে ধরিয়ে দিয়ে জাহানআরা চায়ের গ্লাস তুলে নিল। ময়না বেরিয়ে যেতে কাঞ্চনের দিকে তাকাল, মুখে হাসি ছড়িয়ে প্রশ্ন করল — সাহেবের ইয়ারদোস্ত! না ঘুষ?

চা খেতে খেতে কাঞ্চন একটা চোখ সরু করে হাসল — মনে হয় ঘুষই — আরে

দুনিয়াডাই এইরকম, কে কার উপর দিয়া খাইব! আমিও তো বুঝি। সাহেব এইবার বড় কনটাক্ট কিনব। তাইতে মাইয়ামানুষও ঘুষ দিতাছে। তুই-আমি কয় পয়সা পামু! পয়সার মজা লুটব তো হালার বড় মাইনষে।

জাহানআরা হি-হি করে হেসে কাঞ্চনের গায়ে ঢলে পড়ল। কাঞ্চনের উরুতে আলতো চাপড় মেরে বলল — এত বড় কনটাক্ট কিনব তো নিজেগো মাইয়া-বউ ঘুষ দিলেই পারে। পয়সাও খরচ হয় না। তাগো মাইয়া-পোলারা তো বালাখানায় থাকে। মটরগাড়ি চইড়া ঘুরে। আমার কি মনে কয় জানস কাঞ্চন?

কাঞ্চন ঠাট্টার হাসি ঠোঁটে ধরে রাখল — কইয়া ফালা।

জাহানআরা ঠোঁট কামড়ে ধরল দাঁত দিয়ে একপলক। তারপর বিদ্বেষভরা কণ্ঠে বলল — মনে কয়, ওই শালার মাগিগো ফুরফুইরা গতরে এসিড ফেইকা অগো গতর জ্বালাইয়া দেই।

কাঞ্চন চায়ের গ্লাস নামিয়ে উঠে দাঁড়াল — আরে আকামের প্যাঁচাল ফালাইয়া থো। ওরা আছে দেইখাই তো তর মতো মাগিরা গাড়ি চড়ে, ফিরি মদ খায়। মোটা রেটে পয়সা পায়। আমরাও দুই পয়সা কামাই।

জাহানআরা মুখিয়ে উঠল — রাখ। রাখ। আমরা না হইলে কেমনে তারা কনটাক্ট কিনব! পয়সা লুইটা নতুন কোঠা বানাইব! গাড়ি কিনব। মাইয়া-বউ লইয়া বিলাত-আম্□রিকা যাইব! গোলাপিপট্টির মাইয়ামানুষ না হইলে হইত?

কাঞ্চনের বেরিয়ে যাবার ব্যস্ততা। তবু দাঁড়াল — দ্যাখ জানি! তুই আইজকাল বড় বড় কথা শিখছস। জানসনি শহরে আইজকাল ল্যাখাপড়া জানা ভদ্রলোক ব্যাশ্যা পাওয়া যায়। তাগো ঘর-সংসার আছে, আবার ব্যবসাও করে। এই গুলশানের সাহেবের লোকজনই খালি গোলাপিপট্টিতে মাইয়ামানুষের তালাশে পাঠায়।

জাহানআরার সারামুখে হিংস্রতা ঝলসে উঠল — আবে চুপ থাক শালা। ভদ্দর মাইয়া দেহা আছে। তারা আমাগো নাহাল টিরিকস জানেনি! ওই তো নিচে আছে একজন ভদ্দরঘরের বিদ্বান বিবি। পাঞ্জাবি মিলিটারিরা ইজ্জত মাইরা থুইয়া গ্যাছে। কয়ডা কাস্টমার পায় রাইতে?

কাঞ্চন একটু গম্ভীর হলো — ইয়াসমীনের কথা কস! আরে ওইডা মাইয়ামানুষ নিহি? হিজলের তক্তা।

জাহানআরা মুখ ঝাড়া দিল — তয়! ব্যাশ্যাগিরি কি এতই সোজা?

কাঞ্চন আর দাঁড়াল না। যাবার সময় বলল — তর ইংরেজি বুলিগুলান একবার ঝালাইয়া লইস। সাবরা আবার অনেকে গোলাপিপট্টির মাইয়ামানুষের মুখে ডারলিং শুনবার চায়।

॥ ২ ॥

বাইরে বেলা এখনো উজ্জ্বল। কিন্তু গলির মধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে। দু'পাশের বাড়িগুলোতে ধাক্কা খেয়ে বেলা সরে গেছে আগেই। ঘরে ঘরে মেয়েদের ব্যস্ততা। ছেরুর দোকানে ভিড় জমতে শুরু করেছে। পাশে আরো একটা দেশি মদের দোকান খুলে গেছে। হোটেলের চুলোয় শিককাবাবের মাংস সাজিয়ে কালিঝুলমাখা ছোকরা খরিদ্দারের আশায় নজর রেখেছে গলির মুখে। ঘরে ঘরে কেরোসিনের কুপি জ্বলে উঠছে। মেয়েরা অনেকেই সাজগোজ করে গলিতে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কুসুম এসে দাঁড়াল ইয়াসমীনের ঘরের দরজায়। ইয়াসমীনের ঘরে আরো দু'জন মেয়ে থাকে। তিন হাত বাই চার হাত ঘরের দু'জন মেয়ে মর্জিনা আর হুরী সাজগোজ করে বেরিয়ে পড়েছে।

ইয়াসমীন চৌকিতে পা ঝুলিয়ে বসে ছিল। কুসুম দরজায় দাঁড়িয়ে কুণ্ঠিতভাবে বলল — বুজি আমারে এট্□টু ছোনো দিবা?

ইয়াসমীন মুখ ফেরাল — কে রে? কুসুম! কী চাস?

কুসুম আজ সত্যি গোসল করেছে। শান্তি নয়, জরিনার কাছে সাবান চেয়ে মাথা ঘষেছে, কাপড় ধুয়েছে। তবু ওর অভুক্ত মুখটা ম্লান। কুসুম কুণ্ঠিত স্বরে বলল — এট্□টু ছোনো।

ইয়াসমীন উঠল — আমার তো স্নো-পাউডার কিছুই নেই রে। মর্জিনা, হুরীর থাকতে পারে। ওরা তো ঘরে নেই।

কুসুম এদিক-ওদিক ত্রস্তে দৃষ্টিপাত করে বলল — বুজি। তুমি কইও না। আমারে দেহাইয়া দেও কোনহানে কৌটাটা আছে, আমি আঙুলে উঠাইয়া এট্□টু লইয়া যামু।

ইয়াসমীনের দৃষ্টি থেকে চোখ নামিয়ে বলল — আইজ লোক বহাইতে না পারলে কালু আমারে মাইরা ফালাইব। খাওন পামু না। ভোকে রাইতে ঘুমাইতে পারি না।

ঘরে আগরবাতি জ্বলছে। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে সব মেয়েই ঘরে আগরবাতি জ্বালায়।

হাইকোর্ট মাজারের পানি-পড়া ছিটায় শরীরে। ওরা সবাই মনে করে এতে ব্যবসা ভালো হবে। রোগব্যাধি আক্রমণ করবে না। ইয়াসমীন কেবল পড়া-পানি ছিটায় না শরীরে। ওর অনেক ব্যবহারই এ পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে মেলে না। ও অন্যরকম। পাড়ার অনেকেই ওকে একটু এড়িয়ে চলে। কুসুমের ম্লান শুকনো মুখটায় তাকিয়ে ইয়াসমীন উঠল। মর্জিনা ওর প্রসাধনী ট্রাংকে তালা দিয়ে রাখে। হুরীর পাউডার আর কাজললতা চৌকির তলায় কাগজের বাক্সে ছিল। বাক্স টেনে বের করে ইয়াসমীন বলল — নে তাড়াতাড়ি যা নিবি নিয়ে যা। হুরী এসে দেখলে অনর্থ বাধাবে।

কুসুম দ্রুতহাতে একমুঠো পাউডার আর আঙুলের ডগায় কাজল তুলে নিয়ে বেরোবার মুখেই হুরী এসে দাঁড়াল দরজায়। মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে কুসুমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল — ওই মাগি, চুরি-বাটপাড়ি করনের জায়গা পাস নাই? কত বড় সাহস!

হুরীর হাতের ঝাঁকুনিতে কুসুমের পনিটেল করা সাবান-ঘষা চুল এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। ইয়াসমীন বাধা দিল — এমন করিস কেন হুরী! একটু তো পাউডার নিয়েছে। তোর কিনবার পয়সা আছে, ওর নেই।

কুসুমকে এলোপাতাড়ি চড়থাপড় মারা থামিয়ে হুরী তেড়ে এলো ইয়াসমীনের দিকে — ক্যানলো সোহাগী! এত দরদ হইলে নিজে কিনা দিবার পারস না? ওইসব ভদ্দরলোকি দেহাজ দেখাইবার হইলে যাওগা তোমার ভদ্দরলোকি পাড়ায়। যারা তোমারে খেদাইয়া এই পট্টিতে আইনা ফালাইয়া দিছে।

কুসুমের দিকে আবার প্রচণ্ড বিক্রমে ফিরল হুরী — আ-লো চোরের ঝি! আমার ঘরে আর কয়দিন চুরি করছস ক!

কুসুম মার খেয়ে বিপর্যস্ত হয়ে বলল — আর করুম না বু। ছাইড়া দেও আমারে।

কুসুমকে ঘাড় ধরে ধাক্কা দিয়ে বাইরে ঠেলে দিল হুরী। হুরীর শক্ত হাতের ধাক্কায় কুসুম মুখ থুবড়ে পড়ল বাইরের ইট-ওঠা এবড়োখেবড়ো মাটিতে। হাতের কাজল তার সারামুখে মেখে গেছে। পথের কাদায় সাবান-কাচা কাপড় কর্দমাক্ত। কুসুম উঠে দাঁড়াল। ইটের খোঁচায় ওর ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে। কুসুম একবার জ্বলন্ত বিষাক্ত দৃষ্টিতে তাকাল হুরীর দিকে। তারপর হেঁটে চলে গেল।

নিজের প্রসাধনীর বাক্সটা গুছিয়ে তুলতে তুলতে হুরীর সব রাগ গিয়ে পড়ল

ইয়াসমীনের ওপর। এই বদমাগিরই সব কারসাজি। নিজে এমন ভাব দেখায় যেন রানী-মহারানী। দুপুরবেলা প্রায়ই তো ওর হাঁড়ি চড়ত না। এখন টাকা পেলে মর্জিনার সঙ্গে খায়। তাছাড়া বেশিরভাগ দিন চা-বিস্কুট, নয়তো খালি চা খেয়ে থাকে। মর্জিনাটা আবার ওকে সম্ভ্রম করে। বলে, 'আমাগো লাহান তো না। হাজার হোক ল্যাখাপড়া জানা মাইয়া।' মর্জিনা অনেকদিন নিজের ভাগের ভাত খাওয়ায় ইয়াসমীনকে। হুরীর রাগ হয়। মনে মনে বলে, অত ফুটানি ক্যান লো মাগি? পাড়ায় যখন বইছ, তহন সব সমান। তা না, ঠিকা মাসিরে দিয়া খবর কাগজ আনাইয়া পড়ে। দুপুরে যখন মর্জিনা-হুরী পা ছড়িয়ে বসে উকুন বাছতে বাছতে সিনেমার গল্প করে, ও তখন ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কেনা পুরোনো ইংরেজি বই পড়ে চৌকিতে শুয়ে। সন্ধ্যায় প্রায়দিন গলিতে দাঁড়ায় না। কখনো পরপর রোজ দাঁড়ায়। রোজগার তখন ভালোই করে। বাকি ঘরভাড়া দিয়ে দেয়। আবার কদিন কী হয়, সারাদিন শুয়ে কাটায়। সন্ধ্যায় গলিতে না দাঁড়িয়ে থম ধরে বসে তাকে কুয়োর পাড়ে। কারো সঙ্গে একটি কথাও বলে না।

হুরী উঠে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে সরু চোখে তাকাল ইয়াসমীনের দিকে — এই যে, কইয়া দিলাম চোর-ধাউড়রে লাই দিলে ভালো হইবো না।

ইয়াসমীন স্তব্ধ হয়ে ছিল। কথা বলল না। হুরী আবার বলল — অত দরদ লাগলে নিজে কামাইয়া দিও।

মর্জিনা একজন খরিদ্দার নিয়ে এসে দাঁড়াল দরজায় — ওই তরা বাইরা ঘর থিকা। আমি মানুষ আনছি।

হুরী খারাপ মেজাজ নিয়ে চলে গেল গলিতে মানুষ ধরতে। ইয়াসমীন বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। একটা ঘর। একটাই চৌকি। যার লোক যখন আসে তাকে তখন ঘর ছেড়ে দিতে হয়। একসঙ্গে সবার কাস্টমার জুটলেই লেগে যায় বিপত্তি, হট্টগোল।

ইয়াসমীন ধীরে ধীরে হেঁটে গেল গলি দিয়ে। কে একজন লোক ডেকে বলল — কিরে বহাবি নাকি?

ইয়াসমীন শুনেও শুনল না। গলিটা এখন সরগরম, মানুষের আনাগোনা, দরাদরি, হাসাহাসি, ডাকাডাকিতে মুখর। কুসুম হাত-মুখ ধুয়ে আবার দাঁড়িয়েছে গলির মুখে। কুসুমের পাশে পিরু আর পারুলও আছে। একঘেয়ে নাকি সুরে নিজেদের শরীর আর

পারদর্শিতার বর্ণনা দিয়ে লোক আকর্ষণের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। বারো বছরের পিরু রোগা কাঠির মতো সরু হাত দিয়ে একজন মাঝবয়সী লোকের শার্ট টেনে ধরে অনুনয়-বিনয় করছে তার দেহটা কিনবার জন্য।

পারুল ছুটেছে একজন ছোকরামতো বাবুগোছের লোকের পিছু পিছু। পেছন থেকে শৌখিন বেল্টপরা কোমরটা জড়িয়ে ধরছে বারবার। লোকটা পারুলের হাত ঝাড়া দিয়ে এগিয়ে গেল ওদিকে জরিনার ইশারায়।

কুসুম এতক্ষণে একজন লোক জুটিয়ে ফেলেছে। পাঁচ টাকায় রফা হয়েছে। লোকটাকে নিয়ে বিজয়িনীর মতো ঘরের দিকে চলেছে কুসুম। ইয়াসমীন দেখল লোকটা কুসুমের বাপের বয়সের দাবি করতে পারে। এ পাড়ায় এসে ইয়াসমীন জেনেছে পুরুষের রুচির কতরকম ভেদ আর বিকৃতি আছে। তাই পিরুরও খরিদ্দার জোটে, জোটাতে ব্যস্ত হয় ওরা। খরিদ্দার না পাওয়া মানেই মালিকের হাতে নির্মম লাঞ্ছনা। তার ওপর আছে ভয়, ক্ষুধা — যে ক্ষুধার শিকার হয়েই বেশিরভাগ মেয়ে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় এই পট্টির আলো-বাতাস রুদ্ধ গলিতে ভাঙাচোরা ঘরে শুধু শরীরসর্বস্ব হয়ে এসে উঠেছে, প্রতিদিনের নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা আর অমানবিকতায় হাজার হাজার বছর আগের দাসদাসী বিক্রির হাটের মতো কেনা-বেচায় ক্ষয়ে যেতে যেতে অন্ধকারের প্রাণী হয়ে বেঁচে আছে।

কুয়োর পাড়ের অন্ধকারে শেওলা-ধরা ইটের ওপর বসে পড়ল ইয়াসমীন। গলির ওধার থেকে ময়নার খোলা দোকানের তেলেভাজা আর ভুনা মসলার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে মিশে যাচ্ছে ড্রেনের পচা ময়লা, কুয়োর জমাটপানির ভ্যাপসা গন্ধ আর তাড়ির টকগন্ধের সঙ্গে। এ পাড়াটা এখন শব্দ আর গন্ধের জগৎ। গুণ্ডা, দালাল, চিৎকার, কান্না, ঝগড়া, চটুল হাসি আর পাশবিকতার জগৎ। এ সময় মাঝে মাঝে ইয়াসমীনের দম বন্ধ হয়ে আসে। মনে হয় সারাটা পৃথিবী এখন এক পশুর হিংস্র থাবায় বলের মতো গড়াগড়ি খেয়ে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে। ইয়াসমীনের তখন নিজের গলাটা টিপে ধরতে ইচ্ছে করে। অদৃশ্য কোনো শক্তির কাছে বোধশক্তি-রহিত জড়বস্তু বা দৃষ্টিহীন জন্তু হয়ে যাবার প্রার্থনা করতে ইচ্ছে হয়। ইয়াসমীন তো অন্ধ হয়ে যাবার জন্যই এখানে তাড়িত হয়েছিল। তবু বিবেক কেন চাড়া দিয়ে ওঠে বিদ্রোহে!

সিঁড়ি দিয়ে লোক উঠছে-নামছে। মাসি নেমে এলো। অন্ধকারে ইয়াসমীনকে লক্ষ করে

দাঁড়াল একটু। মাসির স্থূল শরীরটা অন্ধকারেও বেশ অনুমান করতে পারছে ইয়াসমীন। বুঝতে পারছে মাসির একটা পাথর বসান চোখ অপলক নিষ্প্রাণতায় তাকিয়ে আছে ইয়াসমীনের দিকে। মাসি একটু ঝুঁকে কোমরে হাত দিয়ে প্রশ্ন করল — কে লো তুই?

ইয়াসমীন জবাব দিল না।

মাসি আরো একটু এগিয়ে এলো — কে রে? কথা কস না ক্যান?

সখিনাদের ঘরের দরজা খোলা। ওর বুড়ি নানি নাতি-নাতনিদের নিয়ে জটলা করছে। পাশের উঠো-চুলোয় ভাত বসিয়েছে। ওদের ঘরের মাঝখানটা হোগলা-পাতার চাটাই টাঙিয়ে পার্টিশন করে দিয়েছে বুড়ি। এ-ধারে সে সন্ধ্যার পর নাতি-নাতনিদের নিয়ে বসে। ওপাশে তার মেয়েরা শরীর বেচে। ওদের ঘরের একফালি আলো এসে পড়েছে ইয়াসমীনের খোলা চুল আর ডান গালের ওপর। আলোর আভাসে ইয়াসমীনের অবয়ব ভালো করে লক্ষ করে মাসি সোজা হয়ে দাঁড়াল। অসন্তুষ্ট গলায় বলল — ও তুমি! গলিতে খাড়াও নাই যে?

ইয়াসমীন মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দিল — ইচ্ছে করছে না আজ।

মাসির উষ্মা তীব্র হলো — দেহ মাইয়া! তোমার এই বিবিপনা এহানে চলব না। ঘরভাড়া তো দিবা আমারে ঠিকমতো। আমার তো আবার কাজী সাহেবের ট্যাকা বুঝাইয়া দেওন লাগে। যহন আইছিলা তহন তো এক কথায় ঘরে জায়গা দিছিলাম। তুমি না থাকলে ওই ঘরে আরো দুইটা মাইয়া রাখবার পারি।

ইয়াসমীন তীব্রগতিতে মুখ ফেরাল — তুমি এখন যাও মাসি। আমার ভালো লাগছে না। ঘরের ভাড়া আবার বাকি থাকে কবে? সাতদিন বাকি পড়লে তিনদিনে তা পুষিয়ে দিই।

মাসি সুর নামাল। আর সবার মতো সেও এই মেয়েটিকে একটু অন্য চোখে দেখে। মেয়েটা গায়গতরে ভালোই আছে। কিন্তু কী যেন কেন, কোনো লোকই একদিনের বেশি দুদিন ওর ঘরে যায় না। এই তিন বছরেও ওর একটা বাঁধা খরিদ্দার হলো না। ভদ্রঘরের মেয়ে কি মাসি এ পাড়ায় এর আগে দেখেনি নাকি? কিন্তু এটা একেবারেই অন্যরকম।

কেমন শক্ত-শক্ত, কাঠ-কাঠ। মাসি বলল — শরীলডা খারাপ করছে বুঝি? তয় মান্নানের দোকান থিকা ট্যাবলেট কিনা খাইলেই হয়।

ইয়াসমীন হঠাৎ প্রশ্ন করল — মাসি, তোমার মা-বাবা ছিল?

মাসি অন্ধকারে হাসল — শুন ছেড়ির কথা। মা-বাবা ছাড়া আবার কার জন্ম হয় কবে

রে! তুই না বলে ল্যাখাপড়া জানা মাইয়া! এমুন গাবড়ের নাহাল কথা কস ক্যামনে?

ইয়াসমীন শব্দ করে হাসল — তুমি তো বলো ষোল বছর বয়স থেকে এ ব্যবসায় আছ। কিন্তু তার আগে নিশ্চয়ই তোমার মা-বাবা, বাড়ি-ঘর ছিল।

মাসি নরম হয়ে গেল। বলল — যা, ওই সিঁড়ির সামনে থিকা টুলটা আন, বহি। বাতের ব্যথায় খাড়াইবার পারি না।

ইয়াসমীন উঠে গিয়ে টুল এনে পেতে দিল। মাসি বসে চুপ করে রইল। এই অদ্ভুত মেয়েটা মাঝে মাঝে অবাক-করা প্রশ্ন করে মনের ভিত ধরে নাড়া দেয়। অথচ বাড়িসুদ্ধ সবাই মাসিকে সমীহ করে চলে। তাদের কাছে মাসি মানে মোটা একটা মেয়েমানুষ। মাসি মানে এককালের জবরদস্ত বেশ্যা। মাসি মানে কড়া বাড়িওয়ালি, এখনো যে মাঝে মাঝে দুরন্ত গুণ্ডা ছোকরা সাইফকে নিয়ে ঘরে দরজা দিয়ে রাত কাটায়। আফিম খেয়ে নেশা করে। মেয়েদের খদ্দের ভোলাবার জন্য নানা কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি, ফন্দি-ফিকিরের তালিম দেয়। দশ টাকা থেকে সাতশ টাকায় মেয়ে কিনে ব্যবসায় খাটায়। সেই মাসিকে কেউ কোনোদিন অন্যভাবে চিন্তা করে না।

ইয়াসমীন আবারো প্রশ্ন করল — কই মাসি, বললে না?

মাসি সিগারেট বের করে অন্ধকারে ম্যাচ জ্বেলে ধরাল। দিয়াশলাইর আলোয় মাসির মেছতা-পড়া দাগ-ধরা মুখ আর একটা পাথরের চোখ ঝলক দিয়ে আঁধারে হারাল। সিগারেটে টান দিয়ে মাসি বলল — সেই সব কি আর মনে আছে রে!

— সত্যি মাসি মনে নেই? মাসি তোমার নাম ছিল কী?

— আইচ্ছা পাগলি তো তুই! সাঁইঝাবেলা কোহানে কাস্টমার ধরবি, না আমারে লইয়া পড়লি।

মাসি একটু থামল। তারপর কথা বলল — বাবায় কইত সরস্বতী। মায় কইত সতী। হঃ সতীই হইছি।

ইয়াসমীন উৎসাহিত হলো — সবারই একটা নাম থাকে। তাই না মাসি?

— থাকেই তো। ঠিকানাও থাকে। তারপর কই যায়গা ভাইস্যা। তা না হইলে বামুনের মাইয়া আছিলাম। বাবায় নয় বছর বয়সে গৌরীদান করল।

মাসি স্মৃতির সাগরে ভেসে গেল। ন'বছরের মেয়েটি বিয়ের বছর না পুরতেই বিধবা

হলো। বাবার আয় ছিল মাঝারি। ঢাকার কাছেই এক গ্রামে বাড়ি। বিধবা বালিকাটি সেই গ্রামের পুকুরে সাঁতরে বাবার পুজোর ফুল তুলে, পুতুল খেলে বড় হচ্ছিল। যদিও তার মাছ-মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। নিয়মিত উপোস করতে হতো বিধবার আচার অনুযায়ী।

মা কেবল দুঃখ করে বলত — সতীটার কপাল ভাঙা। সতী তখন বোঝেনি ভাঙা কপাল কাকে বলে। বুঝল অনেক দেরিতে। যখন বর্ষার ধলেশ্বরী নদীর মতো শরীরের দুকূল ছাপিয়ে হঠাৎ একদিন যৌবন এসে উপচে পড়ল। মা কণ্ঠে জ্বালা ঝরিয়ে গালি দিত — হারামজাদির গতরে চাওন যায় না। রাইতে ঘুম আহে না আমার। পূজা-আর্চায় মন দে। উপাস থাক।

সতীর ভালো লাগত না এসব। নদীর ঝড়ো বাতাস এসে দুলিয়ে দিত তাকে। বিবাহিতা অন্য বোনদের আর পাড়ার সমবয়সী এয়োদের দেখে মনে মনে জ্বলে যেত সে। সেই ঝড়ো বাতাসেই প্রথম ভেঙে পড়ল সতী। বড় বোনের স্বামীর নজরে এলো সতীর ভরন্ত উছল দেহ। কথাটা চাপাচাপি রইল না। বাবা একদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে গরুপেটা করল।

মা ক্ষিপ্ত হয়ে বলল — গলায় কলস বাইন্ধা গাংগে ডুইবা মর্। যমেও চক্ষে দেখে না তরে।

বড় বোনের স্বামী শালির শরীরে-মনে নতুন জ্বালার স্বাদ এনে দিয়ে সপরিবারে চলে গেল বরিশালে কর্মস্থলে। বিধবা সতী জ্বলে জ্বলে মরতে লাগল বিরহে, লাঞ্ছনায়, অপমানে। দ্বিতীয় মধুকর আসতেও দেরি হলো না। গ্রামেরই এক নিচুঘরের ছেলের সঙ্গে বামুনের মেয়ে সতী ঘর ছাড়ল। কুল ছাড়ল। তারপর ...

ইয়াসমীন প্রশ্ন করল — তারপর?

মাসি এমন আত্মগত হয়ে কথা বলছিল যেন সে এ পাড়ার কেউ নয়। ইয়াসমীনের প্রশ্নে চমকে উঠল — তারপর আর কী? হেই হারামির পুতে একদিন ফালাইয়া থুইয়া পলাইল। তারপর এই পাড়া ...

মাসি নীরবে সিগারেট টানতে লাগল।

ইয়াসমীন বলল — তখন তো হিন্দু বিয়ের আইন পাস হয়ে গেছে।

মাসি উদাস উত্তর দিল — আইন পাস হইলে কী হইব। চল তো আর হয় নাই তহনও।

মাসি একমুহূর্ত নীরব থেকে আবার কথা বলল — একবার বুঝলি, আমি তহন সাচি বন্দরপাড়ায় থাকি। এক বড়ঘরের হিন্দু বিধবা মাইয়া আইল এই লাইনে। কী রং! কী চেহারা! কেউ তারে আনে নাই। নিজে আইয়া খাতায় নাম লিখাইয়া পাড়ায় বইল। হিন্দু খরিদ্দার নিত না সে। কইতো মরলে জানি আর হিন্দুর ঘরের মাইয়া হইয়া না জন্মাই। বিধবা হইলে শুখাইয়া মরুম না তা হইলে।

হনহন করে কে যেন হেঁটে এলো। ইয়াসমীন দেখল ময়না আসছে। ময়না মাসিকে দেখে হাউমাউ করে উঠল — ও মাসি জলদি আহ। এদিকে যে খুন হইয়া গেল।

মাসি ত্বরিতে উঠে দাঁড়াল — কী লো ময়না? কী হইছে?

ময়না উত্তেজিত কণ্ঠে বলল — হইছে কী দেহ আইয়া। বকুল এক মানুষ নিছিল বিশ ট্যাকায়। দশ ট্যাকার বকুল বিশ ট্যাকা পাইয়া নাচতে নাচতে ব্যাডারে লইয়া ঘরে দুয়ার দিছে। ব্যাডা বলে আর কিছু করবার চায় নাই। পকেটে হামলাইয়া একটা লিকলিকা চাবুক আনছিল। বকুলরে উদাম কইরা সারা গতরে চাবুকের বাড়ি বহাইয়া রাখে নাই কিছু।

মাসি নিরুদ্বিগ্ন হয়ে গেল — ও এই!

ইয়াসমীন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে দাঁড়াল — সে কি মাসি! লোকটা পাগল নাকি?

মাসি টুলে বসে পড়ল — পাগল না রে। অনেকে মাইয়া মানুষের শরীলে কষ্ট দিয়া তয় গরম হয়। লোকটা গ্যাছে নিরে ময়না?

ময়না কলবল করে উঠল — হ গ্যাছে। ছেড়ির চিল্লানিতে শান্তি, জরি সবটিতে যাইয়া দরজা ভাইঙ্গা ভিতরে ঢুইকা দেহে বকুলের সারাডা শরীল ফালা ফালা হইয়া গ্যাছে। ব্যাটা এই ফাঁকে পলাইছে।

মাসি নিশ্চিতভাবে বলল — এমুন তো কত হয়। যা ঠিক হইয়া যাইব। বেশ্যার শরীর শক্ত আছে। কিছু হইব না।

ইয়াসমীন চঞ্চল হয়ে উঠল — আমি যাই মাসি। ওকে দেখে আসি।

বকুলের ঘরের নড়বড়ে উই-খাওয়া দরজার একটা পাট ভেঙে পড়েছে। কুপির লাল আলোয় চৌকির ওপর বকুলের অচেতন, উলঙ্গ শরীরটা দেখে শিউরে উঠল ইয়াসমীন। ওর সারাটা শরীর যেন কোনো বন্য ক্রুদ্ধ জন্তু হিংস্র নখে চিরে ফেলেছে। রক্ত ঝরছে। শান্তি

শুকনোমুখে একটা ন্যাকড়ার ফালি দিয়ে ওর শরীর মুছিয়ে দিচ্ছে। শান্তিকে দেখে এখন মনেই হয় না সকালে বকুলের সঙ্গে ওর একটা প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গেছে। ইয়াসমীন পাশে দাঁড়ানো জরিনাকে বলল — দেখ তো মান্নানের দোকানে ডেটল আছে বোধ হয়। নিয়ে আয় এক বোতল।

খরিদ্দারের দেওয়া টাকাটা বকুলের মুঠোয় ধরা ছিল। তার থেকে একটা নোট তুলে নিয়ে জরিনা চলে গেল। বকুলের ঘরের সামনে জমে ওঠা ভিড়টাও পাতলা হয়ে গেল আস্তে আস্তে। যে যার কাজে গেল। মেয়েদের এখন দাঁড়িয়ে থাকার সময় নেই। আট-দশ জন করে খরিদ্দার ধরতে হবে একেক জনকে। হতে পারে এর মধ্যে বকুলের এই অবস্থা করেছে যে, সে লোকটিও থাকতে পারে। কেউ তো কারো চেহারা চিনে রাখে না। বিশেষ করে নতুন লোকের। তবু উপায় নেই। খরিদ্দার চাই, টাকা চাই। একটা রাতের অনেক মূল্য। সারাটা দিন এই রাতের আশাতেই চেয়ে থাকে মেয়েরা। বিশেষ করে যারা দুস্থ। যাদের খরিদ্দার জোটে না। ভাত জোটে না। মালিকের লাথি-চড় খেতে হয়। মাসে একবার গোসলের পানি কেনার পয়সা জমাতে পারে না। পাংশুমুখে মেয়েরা চলে গেল গলিতে দাঁড়াতে।

জরিনা ডেটল নিয়ে ফিরে এলো। শান্তি ডেটলের শিশিটা হাতে নিয়ে বলল — ইয়াসমীন বু! তুমি তো এহানে আছ। আমি যাই। ঘরে মানুষ থুইয়া আইছি। কেউ আবার লইয়া যাইব ফুসলাইয়া।

জরিনাও ঘুরল — আমিও যাই। আইজ সন্ধ্যা থেইকা খালি একজন মানুষ পাইছি।

ওরা চলে যেতে ইয়াসমীন বকুলের শরীরটা ডেটল দিয়ে মুছিয়ে দিল। দলা করা শাড়িটা খুলে ওর শরীর ঢেকে দিল। আস্তে আস্তে ডাকল — বকুল! এই বকুল!

কুপির আলোয় ভাঙাচোরা ঘরটা ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। মুলিবাঁশের বেড়ার পার্টিশনে বকুলের শুয়ে থাকা শরীরের ছায়াটা নিস্পন্দ।

ক্ষীণকণ্ঠে কথা বলল — বু এট্□টু পানি খাওয়াইবা?

ইয়াসমীন কলসি থেকে পানি ঢেলে গ্লাস ধরল বকুলের মুখে। কলহপটু, মুখরা রঙ্গিনী বকুলের চোখের পানি গড়িয়ে পড়ছে। ইয়াসমীন ম্লানকণ্ঠে সান্ত্বনা দিল — কাঁদিস না বকুল।

বকুল এবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল — বু গো। হারামির পুতেরা আমাগো কী মনে করে? আমাগো কী মানুষের শরীল না? আল্লায় কি আমাগো মানুষ বানাইয়া পাঠায় নাই দুনিয়ায়?

ইয়াসমীন গ্লাসটা রেখে স্থিরচোখে তাকাল বকুলের দিকে। বলল — মানুষ না। মেয়েমানুষ।

বকুলের হঠাৎ অজানা কোনো দুঃখ উথলে উঠল। রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত শরীরের বেদনা নিয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে শুরু করল সে।

ইয়াসমীন বেরিয়ে এলো নিঃশব্দে ঘর থেকে। ভাঙা নোংরা অস্বাস্থ্যকর ঘরে বন্দি আত্মার মতো অসহায় বকুলের বিলাপ যেন এ পাড়ার গোপন হৃদয়ের বিলাপ হয়ে ছুটে যাচ্ছে আকুল আর্তি নিয়ে অদৃশ্য কোনো নিয়ন্ত্রণকারীর উদ্দেশে।

ইয়াসমীন এসে আবার কুয়োর পাড়ে টুলটায় বসে পড়ল।

মাসি উঠে গেছে। ঘরে ঘরে এখন কেনা-বেচা, লেনদেন।

জরিনা ওদের ঘরের দরজার সামনে লোক নিয়ে দাঁড়িয়ে দরজায় কিল মারছে। শান্তি লোক নিয়ে ঘরে রয়েছে। এখনো বের হয়নি। জরিনা চিৎকার করছে — ওই শান্তি! বাইরা লো মাগি। কয়শ' ট্যাকার কাস্টমার পাইছস যে এতক্ষণ কপাট লাগাইয়া থুইছস। বাইরা, বাইরা। আমার মানুষ খাড়াইয়া রইছে।

ইয়াসমীন মুখ ঘুরিয়ে নিল। এখনি শান্তি বেরিয়ে জরিনার চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করে গালাগাল দেবে। হয়তো ওদের একটা ঝগড়াও বেধে যেতে পারে। এক ঘরে, একই পুরান পায়া নড়বড়ে চৌকিতে জরিনা, শান্তি, কুসুম ভাগে ব্যবসা করে। সংকট প্রায়ই দেখা দেয়। একসঙ্গে সবার খরিদ্দার এসে গেলেই সমস্যা। প্রথমজনকে আগে ঘরে ঢুকবার অধিকার দিয়ে বাকি দুজন বাইরে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন ঘর খালি করবার তাগাদা দিতে থাকে। রং-তামাশার ইয়ার্কি দিয়ে সতর্কতার সঙ্গে খরিদ্দারকে আটকে রাখে।

সখিনাদের ঘর থেকে ওর নানির কণ্ঠ আর নাতি-নাতনির সুর করে সবুজ সাথী পড়বার শব্দ ভেসে আসছে। ওরা পাড়ার বাইরে ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে পড়তে যায়।

ইয়াসমীন অল্প একটু হাসল। নয় আর সাত বছরের দুটি বালক-বালিকা নয়, যেন আগামীদিনের কাঞ্চন, কালু বা বকুল-জরিনা উদ্দেশ্যহীনভাবে অক্ষর-পরিচয় করছে। অথচ

জীবনের পরিচয় ওদের অন্যরকম। ওদের নানি ছোটখাটো বাড়িওয়ালি। ব্যবসা করায় নিজের মেয়ে আর নাতনিদের দিয়ে। গর্ব করে বলে — আমরা কি আর এই পাড়ায় দশজনের মতো বানের পানিতে ভাইস্যা আইয়া উঠছি নাকি! আমরা চাইর গুষ্টি ধইরা এই পাড়ার মানুষ।

হয়তো বুড়ি গর্বের স্বপ্ন লালন করে মনে, তার সাত বছরের টুকটুকে নাতনিটি রূপে, ছলায়-কলায় জাহানআরাকে ছাড়িয়ে যাবে। আর ন বছরের নাতিটি হবে দুর্ধর্ষ প্রতাপশালী গুণ্ডা।

কিন্তু এমন যদি না হতো! কী হতো, কী হতো তাহলে? ইয়াসমীন অন্ধকারে বসে একচিলতে তারার ফোঁটা চিহ্নিত আকাশে তাকিয়ে হারিয়ে যেতে লাগল। ওই রকম সাত বছরের একটি মেয়ে, বেশ্যাপাড়ার জটিল পরিবেশে নয়, সুস্থ-সুখী একটা বাড়িতে ইলেকট্রিক আলোর নিচে বসে পা দুলিয়ে স্কুলের পড়া মুখস্থ করত। তার তো বকুল, শান্তি, জরিনা অথবা ইয়াসমীন — কারো মতোই হওয়ার কথা ছিল না। তার বাবা ভদ্র চাকরি করত। জীবনে একটা পয়সা ঘুষ খায়নি। মা একবেলা নামাজ কামাই করত না। সেই মেয়েটা স্কুলের পড়া করতে করতে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে 'এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডে'র মতো আয়না দিয়ে অন্য জগতে চলে যেত। সে জগতে পাখি, ফুল, নদী।

অথচ সে কি জানত ওই স্বপ্নের আয়নাটা কত ঠুনকো! একদিন ওটা ভেঙে মাংসাশি হিংস্র-নিষ্ঠুর শ্বাপদেরা বেরিয়ে আসবে। সারা পৃথিবীকে ঘৃণা করতে করতে সেই মেয়েটি হয়ে যাবে ইয়াসমীন। গোলাপিপট্টির সামঞ্জস্যহীন সত্তা। হবে পৃথিবীর চরম বর্বরতা আর নিষ্ঠুরতার উপায়হীন দর্শক। সমস্ত মানুষকে ঘৃণা করবার যন্ত্রণায় দিন-রাত দগ্ধ হবে সে। বৈশাখের আকাশে টুকরো-টুকরো আলোর আভাস নিয়ে দূরে জ্বলছে নক্ষত্রেরা। উদাস চোখে সেদিকে তাকিয়ে ইয়াসমীন ভাবল এমন একটা দূরের জগৎ থেকে সে ছিটকে পড়েছে। কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মতো ছিটকে এসে পড়েছে এই অন্ধকার জগতে। যেমন এসে পড়েছে এ পাড়ার অধিকাংশ মেয়ে। হঠাৎ একচিলতে বিদ্রূপ ঝলসে উঠল ইয়াসমীনের ঠোঁটের কোণে। বাইরের পৃথিবীর লোকগুলো কী নির্বিকারে খাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, হাসছে। আঙুল তুলে ভালো-মন্দ নির্দেশ করছে। সেই তারাই তো তাকে কী যেন একটা গালভরা নাম দিয়েছিল। মনে পড়েছে, বীরাঙ্গনা। চোখের কৌতুক ঠোঁটের ঘৃণাকে করুণার মুখোশে

লুকিয়ে তারা বলেছিল — তুমি বীরাঙ্গনা। যেন বলতে চেয়েছিল 'তুমি সমাজের আর দশটি নিষ্পাপ মেয়ের মতো নও।'

ভেতরটা জ্বলে উঠল ইয়াসমীনের। সত্যিকারের বীরাঙ্গনার মতো সে যদি ওই পচা ঘুণে-ধরা সমাজটার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারত।

কিন্তু পারল কই? সেই প্রচণ্ড ভণ্ডামির শক্তি তাকে এনে ফেলল এই পাঁকের ভেতর।

গলির ওদিক থেকে কে যেন কাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে আসছে।

রহিমনের গলা শোনা যাচ্ছে — ওই হারামি, ওই ছেনালের পুত, ওই শালা ছাড়। ছাড় আমারে; ছাইড়া দে।

ছেরুর দোকানের ছোকরা বছিরের তীব্র ঝাঁঝাল কণ্ঠ শোনা গেল — আর চুরি করবি তো তর গলা কাইটা ড্রেনে ফালাইয়া দিমু। শয়তান মাগি। চুরি কইরা মাল খাইবার গেছে।

পাশ দিয়ে দ্রুত হেঁটে যেতে যেতে কে যেন প্রশ্ন করল — কিরে বছির! মাগি বুঝি আবার চুরি করছে?

রহিমনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে বছির উত্তেজিত নালিশ ছুড়ল — হারামি মাগির বিলাইর পরান। রাইত-দিন সবটির লাথ্□থি কিল খায়। তবু মরে না। আইজও দোকান থনে মাল চুরি করছে। অ্যামনে তো পাগল সাইজা বেড়ায়। হারামি-বুদ্ধি প্যাট ভরা।

রহিমন মুখিয়ে উঠল — ওই কুত্তার ছাউ, তুমি য্যান সাধু। চুরি কইরা বোতল বেচস না তুই মাইয়াগো ঘরে?

বছির রহিমনের রোগা পাঁজরে ঝেড়ে লাথি বসাল — চুপ থাক খানকি। প্যাটে ভাত নাই ভিক্ষা কইরা মাল খায়, আবার বড় গলায় কথা কয়।

রহিমনকে দেওয়ালের ওপর ঠেলে দিয়ে বছির চলে গেল। রহিমন কতক্ষণ ভেউ ভেউ করে কাঁদল। কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল — গুষ্টিকিলাই খানকির পুত। খ্যাতা পুড়ি তর গুষ্টির। কান্না নিচু লয়ে নেমে কণ্ঠস্বর তীব্র হলো রহিমনের — দেহুম। আমিও দেহুম। কে কয়দিন যৈবনের ফুটানি করে। কে কয়দিন বিলাতি খায়, নাগর লইয়া নাচে।

রহিমন একটানা বকবক করে চলল। বোধ হয় ভিক্ষে পায়নি আজ। তাড়ি কিনে নেশা করতেও পারেনি। অথচ নেশা করতে না পারলে সে পাগল হয়ে যায়। রহিমন উঠে দাঁড়াল। অন্ধকারে পা ঘষতে ঘষতে ইয়াসমীনের পাশে এসে দাঁড়াল। অন্ধকারে ঠিকই

চিনল ইয়াসমীনকে। ইয়াসমীনের পায়ের কাছে বসে পড়ে দু'হাঁটু জড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ল — ও মাইয়া, আমারে পাঁচটা ট্যাকা হাওলাত দিবি? আর এট্□টু না খাইলে যে আমি মইরা যামু।

রহিমনের মুখ থেকে দেশি মদের ঝাঁঝাল টক গন্ধ আসছে। নেশা করেছে ও। হাঁটু থেকে রহিমনকে ছাড়িয়ে দিল ইয়াসমীন। বলল — আমার কাছে এখন টাকা নেই।

রহিমন আবার পা জড়িয়ে ধরে নাছোড়বান্দার মতো বলল — এইডা একটা কথা হইল! সাইন্□ঝাবেলা যোওয়ান মাগির কাছে ট্যাকা নাই! দে দে। কাইলই শোধ দিয়া দিমু।

ইয়াসমীন রহিমনকে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল — কী মুশকিল! বলছি আমার কাছে টাকা নেই।

রহিমন চটে উঠল — দিবি না তো দিবি না। ঠেলা মারস ক্যান লো খানকি? বুঝছস এত দেমাগ ভালো না। এই বেশ্যাপাড়ায় কে কয়দিন ঠ্যাহার দেহাইবার পারে! যৈবন গেলে কুত্তাটাও ফিরা চাইব না। ব্যামোতে নাক খইসা পড়ব। পাগল হইয়া গলায় ফাঁস দিবি, তা না হইলে না খাইয়া দাপাইয়া মরবি। কেউ ফিরাও চাইব না।

রহিমনের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ইয়াসমীন উঠল। কোনদিকে যাবে? ঘরে তো জায়গা নেই। ওখানে, মর্জিনা-হুরীর বিকিকিনি চলছে। মাথাটা কেমন ব্যথা করে উঠছে। এ বাড়িতে আসবার পর ইয়াসমীনেরও প্রায়ই মাথাব্যথা হয়। সবার মতো সেও কোডোপাইরিন বড়ি কিনে খায়।

ইয়াসমীন মান্নানের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। দোকান এখন সরগরম। জোর কেনা-বেচা চলছে। পাটাতনের ওপর লাল কাপড়ে মুড়ে রাখা খিলিপানের গোছায় পানি ছিটিয়ে মান্নান দাঁত বের করে হাসল — কী নিবা বু?

মান্নানও ইয়াসমীনকে কিছুটা সম্ভ্রম করে। ইয়াসমীন ম্লানকণ্ঠে বলল — একটা কোডোপাইরিন ট্যাবলেট দাও। কাল পয়সা দিয়ে দিব।

মান্নান বাকির কারবার করে না। এ পাড়ার মেয়েদের সে চেনে। বাকি ফেললে সহজে পয়সা ওঠান যায় না। একমাত্র ইয়াসমীনই ব্যতিক্রম। বাকির পয়সা ঠিকঠাক মতো ফেরত দেয়। একটা ট্যাবলেট দিয়ে মান্নান বলল — ওই সপ্তাহের বড়ির দাম কইলে বাকি রইছে।

ইয়াসমীন মাথা নেড়ে বলল — এ সপ্তাহেই দিয়ে দিব। বড়ি মানে জন্মনিয়ন্ত্রণ বটিকা,

যা এ পাড়ার সব মেয়েকেই কিনতে হয় মান্নানের দোকান থেকে। ভাত না পেলেও বড়ির পয়সা জোটাতেই হয়। মাতৃত্বকে এরা বিভীষিকার চোখে দেখে। মা হওয়া মানেই খরিদ্দার কমে যাওয়া। রোজগার কমে যাওয়া। তার ওপর আছে একটা শিশুপালনের খরচের দায়িত্ব। তবু দুর্ঘটনা ঘটে যায়। আর সে ঘটনার ফলটা ওদের জীবনে অভিশাপ হয়ে আসে।

ইয়াসমীন ফিরে দাঁড়াতেই মান্নান বলল — আইজ মানুষ বহাও নাই?

ইয়াসমীন জবাব দিল না। মান্নান দ্রুতহাতে খরিদ্দারকে পান দিতে দিতে বলল — বুঝছি মেজাজ ভালো নাই।

ফিরতে ফিরতে ইয়াসমীন শুনল মান্নান কাকে যেন বলছে — হইব না ক্যান। ল্যাখাপড়া জানা মাইয়া। মেজাজখানও খান্দানি। তয় মাইয়াডা ভালো।

রাত বাড়তে থাকে। পাড়ার উচ্ছল জীবন্ত চেহারা ক্রমে নির্জীব হয়ে আসে। জমজমাট ছেরুর দোকানে ভিড় পাতলা হয়। কেনা-বেচার আসর গুটিয়ে যায়। গলির মোড়ে দেশি মদ খেয়ে মাতলামো করে দু'চারজন। ময়নার খোলা দোকানে টিনের ট্রের ওপর স্তূপ করে রাখা ভাজাভুজির বাকিটা যা পড়ে থাকে, দু'চারজন মেয়ে এসে কিনে নিয়ে যায় রাতের খাবার হিসেবে। ভাত খায় ওরা একবেলা, রাতে রান্নাবাড়ার সুযোগ কারোই বিশেষ হয় না। দুপুরে রাঁধা ভাতের কিছু অংশ থেকে গেলে তাই দিয়েই পেট ভরিয়ে ক্লান্ত, অবসন্ন মেয়েগুলো শুয়ে পড়ে। একেক খুপরিঘরে তিন-চারজন মিলে দলা পাকিয়ে পড়ে ঘুমোয়। বাইরে গোলাপজান বুড়ির কাশির শব্দ বাজতে থাকে একটানা। মাঝে মাঝে গলিতে ভারী ওজনের পায়ের আওয়াজে ঘুমের মধ্যেই কেউ চমকে ওঠে। সাধারণ খরিদ্দারের মতো এরা আসে না। এরা বিশেষজন। মাসি ঘুমাতে যায় সবার পরে। মান্নানের দোকানের সামনে কাঠের টুলটায় বসে গল্প করে অনেক রাত অবধি। বাইরে বড় স্ট্রিট-লাইটগুলো একাকী দাঁড়িয়ে মধ্যরাতের পথ আলোকিত করে। আর গলির ভেতর রাতটা কিছু আলো, কিছু অন্ধকার, কিছু ঘুম, কিছু জাগরণ নিয়ে ব্যবসার জাল ছড়িয়ে রাতের প্রহর অতিক্রম করে।

॥ ৩ ॥

পিরু শুয়ে শুয়ে কাঁদছিল। পাশে পারুল হাত-পা ছড়িয়ে হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। ওপাশে

ঘুমোচ্ছে মমতা। পারুলের ঘুম বড় বিশ্রী। ঘুমের মধ্যে দুটো পা তুলে দিয়েছে পিরুর গায়ের ওপর। পিরুরা থাকে দোতলায় একেবারে শেষপ্রান্তের ঘরে। ঘরটা একেবারে ছোট। একটাও জানালা নেই। মেঝের সিমেন্ট প্রায় সবটাই উঠে গেছে। দেওয়ালের নোনা ধরা জরাজীর্ণ ইটগুলো দেখলে মনেই হয় না, এর ওপর কোনোদিন চুন-সুরকির আস্তরণ ছিল। কড়িবর্গার পাশ থেকে প্রায়ই চাপড়া চাপড়া আস্তর ভেঙে পড়ে। বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। ছাদ চুঁইয়ে পানি পড়ে সারাটা ঘর ভেসে যায়। বৃষ্টির দিনে পানি অবশ্য সবার ঘরেই পড়ে। তবে এদিকের ঘরগুলোর মতো দুরবস্থা আর কারো নয়। ঘরটার মধ্যে ঢুকলেই পিরুর ভয় করে। তবু এই ঘরে রোজ অনেকগুলো খরিদ্দার বসাতে হয় তাদের। খরিদ্দারের দেওয়া পয়সা পিরু পায় না। সে স্বাধীন ব্যবসার মেয়ে নয়। শরীর বেচার পরিবর্তে ডাল-ভাত খেতে পায়। একখানা কাপড় পায় কখনো কখনো। এইটুকুর জন্য অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয় মালিকের কাছে। ওদের মালিক হীরু।

হীরু এ পাড়ায় দশটা মেয়ের মালিক। পিরুরা তিনজন থাকে এ ঘরে। ঘরটার জন্য পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিতে হয় রোজ। ঘর ভাড়া দিয়ে লাভের অংশ প্রায়দিনই থাকে না। তখন সে হিংস্র হয়ে ওঠে। মেয়েগুলোকে যাচ্ছেতাই গালাগাল করে। নির্দয়ভাবে প্রহার করে। মারের ভাগটা বারো বছরের পিরুর ভাগ্যেই বেশি জোটে। আর খাওয়া জোটে সবার চাইতে কম। আজো পিরু খরিদ্দার জোটাতে পারেনি। লুকিয়েছিল ছাদে উঠে। মাসির কাছে ধরে এনেছিল হীরু। পিরুকে প্রচণ্ড মারধর করেছিল। কেউ তাকিয়েও দেখেনি। যার যার নিজের অধীনের মেয়েকে সে খুন করে ফেললেও অন্যরা তাতে কোনো কথা বলবে না। এটাই এ পাড়ার নিয়ম। হীরু রেগে গিয়ে পিরুর চুল ধরে এনে ছুড়ে ফেলেছিল মাসির সামনে। পিরুর ছোট্ট বুকটায় ভারী ওজনের লাথি মেরে বলেছিল — কও দেহি মাসি এইডারে লইয়া কী করি। লোক না বহাইয়া ছাদে পলাইছে।

মাসি ভ্রূ কুঁচকে পিরুকে দেখেছে, কী লো হারামি, ছাদে পলাইছস ক্যান?

পিরু জবাব দেয় না।

— হীরু চিৎকার করতে থাকে — একশ ট্যাকা নগদ দিয়া অরে কিনছি। পয়সা কি আমার গাছের গোটা! কাপড়, খাওন, ঘর ভাড়ায় আমি ফতুর হইয়া গেলাম। আর হারামি পলাইয়া থাকে। তুমি এইডারে ঠিক কর।

হীরু একটু পরেই ফিরে এলো স্থূলদেহী এক মাতালকে নিয়ে। পিরুকে ধাক্কা মেরে বলল — যা, ঘরে লইয়া যা। আবার পলাইলে তরে আমি খুন কইরা ফালামু।

পিরু হাত দিয়ে মাসির টুলের পায়া আঁকড়ে ধরে অটল হয়ে থাকে।

হীরু প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল — কিরে? গেলি না অহনও?

মাসিও বলল — পিরু ঘাউড়ামি করিস না। যা, ঘরে যাইয়া লোক বহা।

পিরু হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল — আমি পারুম না। আমি মইরা যামু। আমারে ছাইড়া দেও। তোমাগো পায়ে ধরি।

মাসি লাথি মেরে পিরুর হাত ছাড়িয়ে দিল টুলের পায়া থেকে — নে, নে। অত নক্রা দেখাইস না। অন্য মাইয়ারা পারে, তুই পারবি না ক্যান?

পিরু নড়ে না, কাঁদতে থাকে — আমারে ছাইড়া দেও। আমারে মা-বাবার কাছে যাইবার দেও। আমি ভিক্ষা কইরা খামু। আমি মাইনষের বাড়িতে কাম করুম।

হীরু এবার ভয়াল হয়ে ওঠে। পিরুকে লাথির ওপর লাথি মারতে থাকে। চিৎকার করে বলে — ইঃ ছাইড়্যা দিমু। আমার পয়সা উঠাইয়া দিবি হারামি।

হীরুর লাথি-চড়ে মাসির পায়ের কাছে গড়াগড়ি খেতে থাকে পিরু। মাসি নির্বিকার হয়ে বসে থাকে। একসময় নিস্তেজ হয়ে আসে পিরুর ছোট্ট দেহটা। পিরুর অবসন্ন শরীরটাকে মরা কুকুরের মতো টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে ঘরে ছুড়ে ফেলে হীরু। তারপর খরিদ্দারকে ডেকে ঘরে তুলে দিয়ে বেরিয়ে এসে মাসির পাশে বসে সিগারেট ধরায়। পিরুর কাতরানি এখানে এসে পৌঁছয় না।

অন্ধকার ঘরে পারুলের পা দুটা শরীরের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল পিরু। তার সারাটা শরীর ব্যথায় অসাড় হয়ে আছে। হীরুর নিষ্ঠুর মারের পর চারজন খরিদ্দার নিতে হয়েছে। হীরুর খরিদ্দাররাও হীরুর মতোই নিষ্ঠুর। পাঁজর-সর্বস্ব পিরুর দেহটাকে তারা বুভুক্ষু জন্তুর মতো ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেয়েছে। মনে হয় হীরুই যেন শিখিয়ে দিয়েছে। একজনের নিষ্ঠুর দাঁতের কামড়ে পিরুর গলার মাংস উঠে গেছে। পিরু আর পারে না। পিরু মরে যেতে চায়। কিন্তু তবু বেঁচে আছে। নিষ্ঠুর রাতের অভিজ্ঞতা নিয়ে দিনের বেলা সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে গালি দিয়ে গল্প করে পিরু। গুটি খেলে। থালা হাতে নিয়ে ভাতের জন্য দাঁড়ায়। পিরু ভালো রোজগারি নয়। তাই পিরুর

থালায় প্রায় দিনই ভাত পড়ে না, যেদিন পড়ে সেদিন শুধু ডাল-ভাত। যা খেয়ে পিরুর খিদে মেটে না। না খেয়ে পিরুর হাত-পা ঝিমঝিম করে। এবড়োখেবড়ো নোংরা গলিটা চোখের সামনে সাপের মতো দুলতে থাকে।

পারুল ঘুমোচ্ছে। ও পিরুর মতো নয়। বয়স যদিও পারুলের পিরুর কাছাকাছি। তবু এ বাড়ির ভাবসাব সে বুঝে ফেলেছে। খরিদ্দার ধরায় প্রচণ্ড উৎসাহ তার। যদিও খরিদ্দার ধরতে অনেক পরিশ্রম করতে হয় তাকে। তবু তাদের খুশি করতে সে ব্যগ্র। খুশি করে বখশিশও পায়। বখশিশটা ওর বাড়তি রোজগার। সেটা দিয়ে ময়নার দোকানের খাবার কিনে খায়। রঙিন ফিতে, চুলের ক্লিপ কেনে মান্নানের দোকান থেকে। বড় মেয়েদের দলে বসে সিনেমার গল্প শোনে। পিরুকে বলে — আমি একদিন জাহানআরা বুর মতো হমু। গাড়ি চইড়া বাইরে যামু। দোকান কিনুম। পায়ের উপর পাও দিয়া সবটিরে হুকুম করুম।

পারুল এসেছে দুর্ভিক্ষের সময়। ওর সৎমা ওকে দালালের কাছে বিক্রি করে গেছে। বাড়ির জন্য কোনো পিছুটান নেই ওর। জ্ঞান হয়েছে পর থেকেই সৎমার গঞ্জনা সহ্য করেছে। বাবা দেখেও দেখেনি। বাবার কথা তুললে পারুল থুথু ছিটিয়ে বলে — ওইটা একটা হারামখোর আছিল।

দুর্ভিক্ষের আগেই পারুলের বাবা মরেছে। বেঁচে থাকতে মানুষের ক্ষেতে কামলার কাজ করত। জমিজমা ছিল না এক কানিও। আকালের সময় ছেপড়া ঘরসমেত ভিটাও সৎমা বেচে দিল। তারপর অনেকগুলো সৎ ভাই-বোন আর সৎমার সঙ্গে পারুল শহরে এলো। এখানে-সেখানে স্রোতের শ্যাওলার মতো ভাসতে ভাসতে অবশেষে এলো এই মোক্ষম স্থানে। না খেয়ে শহরের পথে হাঁটতে থাকা ক্লান্ত ক্ষুধার্ত অবসন্ন পারুলের দাম যাচাই করে ফেলল সৎমা। লঙ্গরখানার ভাত-ডালের লোভ দেখিয়ে মাত্র তিরিশ টাকায় বেচে দিল পারুলকে। ক্ষুধার্ত পারুলের অবসন্ন দেহটা কিনে নিল মেয়ে ব্যবসায়ীরা। পারুলের তাতে আক্ষেপ নেই। ক্ষুধার জ্বালার কষ্ট, সৎমায়ের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার হাত থেকে সে বেঁচে গেছে।

কিন্তু পিরু তো পারে না পারুলের মতো হতে। রাতে লাঞ্ছিত ক্ষুধার্ত শরীরটা নিয়ে বিছানায় এলেই তার ছোট্ট বুকটা দুমড়ে মুচড়ে প্রচণ্ড কান্না উথলে ওঠে। পিরুর চোখের পানির ফোঁটায় এই নোংরা বাড়ি নয়, সবুজ এক গ্রামের ছবি ভেসে আসে। সারাটা দুপুর গাঙে ঝাঁপাঝাঁপি করে নেয়ে উঠে পিরু ক্ষেত থেকে এককোঁচড় কলই শাক নিয়ে বাড়ি

ফিরত। দেখত মা পাটখড়ি জ্বালিয়ে উঠোনে চুলো ধরিয়েছে। মাটির 'রাইঙে' ভাত বসিয়েছে।

পিরুদের অবস্থা ভালো ছিল না। ওর বাবা ফসলের দিনে মানুষের ক্ষেতে পৈরাত দিত। বর্ষায় ভাগের নৌকায় গাঙে মাছ ধরত। পিরুদের নিজের জমি ছিল না। গরু ছিল না। পিরুর মা অবস্থাপন্ন জোতদার বাড়িতে বাড়া ভানত, মরিচ-কলাই বাছত। পিরু আর ওর ছোট্ট ভাই আলি সারাদিন গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়াত। তাতে পিরু কি দুঃখী ছিল? না তো। রাতে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে চালের ওপর টুপটাপ করে শিশির পড়ার শব্দ শুনত পিরু। শুনতে পেত আলু ক্ষেতে জাকার দিয়ে শেয়াল ডাকছে। বর্ষার প্রবল বর্ষণের ধারার মধ্যে কান পেতে শুনত ধুপধাপ করে নদীর পাড় ভাঙছে। তখন পিরুর খুব ভয় করত। মাকে জড়িয়ে কেঁদে উঠত। মা পিরুর গায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলত — ও পিরু, পিরু রে, কী হইছে? ডরাইছস? খোয়াব দেখছস?

পিরু মাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ত।

পারুল পাশ ফিরে ঘুমের মধ্যেই অশ্লীল গালি ছুড়ল। পারুল ঘুমিয়েও এ বাড়ির স্বপ্ন দেখে। পিরু আবার চোখের পানিতে স্বপ্ন ফুটিয়ে তুলল। সেই যে তাদের বাড়ির সামনে একটা ছোট খাল ছিল। পৌষ মাস থেকে চৈত্র-বৈশাখ মাস পর্যন্ত যার বুকটা শুকিয়ে খটখটে হয়ে থাকত। বাঁশের সাঁকোগুলো ঝুলত অনেক উপরে। পিরু খেলার সাথীদের সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে খাল পার হয়ে ওপারে মৃধাদের বাগানে আম কুড়াতে যেত। আষাঢ়ে সেই খালটা কানায় কানায় ভরে উঠত। লোকে বানা দিত। দোয়াইর পাতত। দিনরাত নৌকা আসা-যাওয়া করত। রাতে শুয়েও খাল দিয়ে যাওয়া নৌকার দাঁড়ের ছপছপ আর লগির টানের শব্দ শুনতে পেত পিরু। এখনও কি সেই খালটা আছে! যেটায় খরায় পানি টানত, বর্ষায় কূল উছলে উঠত। বড় গাঙ থেকে হুহু করে পানি ছুটে আসত। পিরু শুয়ে শুয়ে ভাবত বানায় যেন কত মাছ আটকা পড়েছে। ছাটা ইচা, বাইলা, গজার, পাঙ্গাশ। বর্ষা চলে গেলে ভূঁইয়াবাড়ির কচুরিভর্তি ডোবায় নেমে ডুবিয়ে রাখা নৌকা থেকে জাল দিয়ে পলো ফেলে শিং, মাগুর, কৈ ধরে ফিরত পিরু।

মা হাসিমুখে মাছ কুটতে কুটতে পিরুকে বলত — ও পিরু, কাইল গামছা পাইতা গুঁড়া ইচা ধইরা আনিস। ভর্তা বানাইয়া দিমু।

পিরু উৎসাহে মাথা নাড়ত। বাবা কেবল চাল, তেল, ডাল কিনে বাড়ি ফিরত। পিরু এখানে-সেখানে ঘুরে কলমিশাক, কচুর লতি তুলে আনত। বাবার যখন রোজগার থাকত না, মা বড় গৃহস্থ বাড়িতে কাজ নিত। পিরুই তখন সংসারের দায়িত্ব পালন করত। ঘরের পিড়া লেপত, শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে আনত। পিরুর একটা ছাগল ছিল। কী যে নাম ছিল? হ্যাঁ মনে পড়ছে, বাতাসী। বাতাসীকে বাগানে গোছড় দিত পিরুই। মৃধাদের বাগান থেকে কাঁঠাল পাতা ভেঙে এনে বাতাসীকে খেতে দিত। বলত — বাতাসী বাচ্চা বিহাইলে একটা আলিরে দিমু। আরেকটা হালিমনরে দিমু।

হালিমন ছিল পিরুর প্রাণের বন্ধু। দু'জনে একসঙ্গে গাঙে নাইতে গেছে। ধান কাটা ক্ষেতে ধান কুড়িয়েছে। কচুর লতি তুলেছে। খালে গামছা পেতে গুঁড়া ইচা ধরেছে। একবার হালিমনের সঙ্গে চৈতসংক্রান্তির মেলায় গিয়েছিল। কত আনন্দ করেছে। নাগরদোলায় চড়েছে।

বিন্নী-বাতাসা কিনেছে। ফিরতে দেরি হয়েছিল বলে মায়ের কী উদ্বেগ! মা প্রায় কেঁদে ফেলেছিল। মা এরকমই ছিল। পিরুর একটু অসুখ-বিসুখ হলেই মা ছুটে যেত ফকিরের কাছে। পানিপড়া, তেলপড়া আনত। মানত করত। বাবাও অস্থির হতো। কোথায় সেই মা? কোথায় বাবা? কোথায় সেই গ্রাম? কোথায় নীল বিশাল নদী, সবুজ ক্ষেত আর খালপাড়ের স্বাধীন জীবন?

কোথা থেকে কেমন করে একটা দুর্যোগ এসে যেন সব ভাসিয়ে নিল। সেবার বর্ষায় হুহু করে ঢল ছাড়ল বড় গাঙ। ঘোলা পানির স্রোত এসে ভাসিয়ে দিল গ্রামটাকে। পানি বাড়তে বাড়তে সুপুরি বাগান ছাড়িয়ে পিরুদের ভিটায় উঠল। ঘর ডুবল। মাচার উপর বসে অভুক্ত পিরুরা দেখল ঘর ভেসে যাচ্ছে। রিলিফ এলো। রিলিফের গম খেয়ে বেঁচে থাকতে থাকতে নিঃস্ব হয়ে গেল পিরুরা। সর্বগ্রাসী বানে যখন টান ধরল, পিরুদের ঘরটা তখন ধসে পড়েছে। সারাটা গ্রামেই হাহাকার। বাতাসীকে বিক্রি করে সেই টাকা সম্বল করে পিরুর বাবা সপরিবারে লঞ্চে উঠল। সবাই বলেছে ঢাকায় গেলে কাজ পাওয়া যাবে। পিরুর বাবার মতো পিরুও ভাবল শহরে অনেক টাকা। সেখানে থেকে রোজগার করে টাকা জমিয়ে দেশে ফিরবে তারা। পিরুর বাবা আবার নতুন ঘর তুলবে। বাতাসীকে কিনে নিয়েছে মৃধাবাড়ির ছোট বউ। তার কাছ থেকে টাকা দিয়ে ফিরিয়ে আনবে পিরুর আদরের

ছাগলকে।

কিন্তু ফিরে যাওয়া হয়ে ওঠে না। বাবা হলো ঠেলাগাড়িওয়ালা। মা তিন-চারটে বাড়ির ঠিকে ঝি। ততদিনে তাদের সংসারে আরেকটা শিশুর আবির্ভাব হয়েছে। মালিবাগের বস্তিবাড়িতে পিরু ভাই-বোন দেখে, রাঁধে। কখনো হাট-বাজার করে। অবসর সময় ভাবে, আর কতদিন লাগবে বাবার টাকা জমিয়ে দেশে ফিরে যেতে?

বস্তিতে নানা ধরনের লোকের আনাগোনা। একদিন দুপুরে বাবা ঠেলা বাইতে গেছে। মা গেছে বাসার কাজে। আর আলি ছালা নিয়ে গেছে শহরের অলিগলি ঘুরে ডাস্টবিন ঘেঁটে কাঠ কুড়াতে। দু'জন অচেনা লোক এলো পিরুদের ঘরে। একজন বলল — ওই তর মায়ের এক্সিডেন্ট হইছে। তরে যাইবার কইছে। পিরু প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর ছোট ভাইটাকে কোলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে পড়ল। অন্য একজন বলল — কান্দিস না। তর মায় অহনও বাঁইচ্যা আছে। চল তাড়াতাড়ি। বাচ্চাডারে দে আমার কোলে।

পিরু বিশ্বাস করল। পিরু ঘরের বাইরে পা দিল। আজো পিরু ভেবে পায় না কেন সে বিশ্বাস করেছিল ওই দু'জন লোকের কথা। পিরু আজও জানে না কোথায় ফেলে দিয়েছে তার ছোট ভাইটাকে নিষ্ঠুর গুণ্ডারা।

একজন বাচ্চা নিয়ে পিছিয়ে পড়েছিল। আর একজন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা বেবিট্যাক্সিতে বসিয়ে পিরুকে নিয়ে এসেছিল পুরোন ঢাকার এক গলিতে। পিরু তখন পথঘাট ভালো করে চিনত না। তারপরই পিরু অন্য এক জগতে এসে পড়েছিল। সেই লোকটা আরো দুজন লোক নিয়ে তার দেহটাকে মজার খেলায় নামিয়েছিল। সেই ভয়ংকর কথা মনে পড়লে আজো পিরু শিউরে ওঠে। তারপর পিরু বিক্রি হয়েছিল হীরুর কাছে। হীরু তাকে নিয়ে এলো গোলাপিপট্টিতে।

বালিশে মুখ চেপে কাঁদতে লাগল পিরু। বাবা কি ঠেলাগাড়ি চালিয়ে দেশে ফিরে যাবার টাকা জমাতে পেরেছে এতদিনে? পিরু এই অন্ধকার আবদ্ধ জীবনে বসে কিছুই জানতে পারে না। জানে না বাবা পথে পথে তাকে খুঁজে ফেরে কিনা। জানে না মা খুদের চাপড়ি বানিয়ে পিরুর কথা মনে করে চোখের পানি মোছে কিনা!

সিঁড়ি দিয়ে কে যেন উঠে এলো। বোধ হয় জাহানআরা ফিরল। মাঝে মাঝে রাতে ও বাইরে যায়। গাড়ি চড়ে ফেরে। পরদিন অনেকেই

সম্ভ্রমের সঙ্গে ওকে ঘিরে বড়লোকদের বড়লোকি খেয়ালের বিচিত্র সব গল্প শোনে। পারুলকে একটু ঠেলে দিয়ে চোখভরা পানি নিয়েই পিরু একসময় শোনে।

॥ ৪ ॥

দুপুরে শান্তি এলো ইয়াসমীনের কাছে। ইয়াসমীন ঘরেই ছিল। মর্জিনা আজ ঠিকা মাসিকে দিয়ে মাংস আনিয়েছে বাজার থেকে। কাল কপালগুণে অনেকগুলো ভালো খরিদ্দার জুটে গিয়েছিল তার। হুরী তার নিজের চুলোয় ভাত সিদ্ধ করতে করতে ঠোঁট মুচড়ে টিপ্পনী কাটল — একদিনের কামাই লইয়া অত ফুটানি। মাছ-গোশ্□ত খাওন। অত বাবুয়ানি ভালো না।

কেরোসিনের চুলোয় হাতল-ভাঙা কড়াইতে মাংস নাড়তে নাড়তে মর্জিনা মুখ ঝামটা দিল — তর অত জ্বলে ক্যান লো শালি? আমার গতরের কামাই দিয়া আমি যা খুশি তা-ই খামু।

তারপর ইয়াসমীনের দিকে তাকিয়ে বলে — কী কও গো বুজি। কথাটা কি ভুল কইছি? এ পাড়ায় তো কেউ কারো ভালো দেখবার পারে না। হিংসায় জ্বইলা পুইড়া মরে।

নিজের মাটির চুলোয় কাঠ ঠেলে দিয়ে হুরী চোখ পাকাল — ওই ছিনাল! অত গরম দেহাস ক্যান? এহানে কে কারটা খায়। তুইও ঘরভাড়া দিয়া থাকস, আমিও থাকি। তয় তর মতো লুকাছাপি আমাগো নিকি। আমরা তো ব্যাশ্যা হইছি, মাইনষে আমগো ব্যাশ্যা কইয়াই জানে। তর মতো নিহি যে নাচবার নাইমা ঘোমটা টানুম।

হুরীর কথার খোঁচাটা মর্জিনার বিঁধল। কথাটার পেছনে একটা সত্য আছে। মর্জিনা দু'চার মাস পরে পরে ফরিদপুরের এক গ্রামে ওর দেশের বাড়িতে যায়। দেশে মা-ভাই সবাই আছে। বাবা পঙ্গু। ভাইটা বাজারের ধানের কলে ঠিকা মজুরের কাজ করে। তাতে কারোই খাওয়া চলে না। গ্রামের এক মেয়েলোকের সঙ্গে মর্জিনা কাজের খোঁজে শহরে এসেছিল। শহরে অনেক হেঁটেও বাসার কাজ পায়নি মর্জিনা, যা দু'একটা পেয়েছে তাও ঠিকা কাজ। খাওয়া বাদে বিশ টাকা মায়না। তা দিয়ে মর্জিনা কেমন করে চলে! বস্তির ঘরের ভাড়াও বেড়েছে। আগে যে ঘর ছিল পাঁচ টাকা, এখন তিরিশ টাকার কমে পাওয়া যায় না। তার ওপর আছে নিজের খাওয়া-পরা। দেশে অভুক্ত মা-বাবা, ভাইবোনদের জন্য

খোরাকির টাকা পাঠানো। বাধ্য হয়ে শহরের অলিতে-গলিতেই দেহ বেচতে শুরু করেছিল মর্জিনা। তারপর চলে এসেছে এই পল্লীতে। সতের বছরের মর্জিনা সুন্দরী না হলেও মোটামুটি স্বাস্থ্যবতী। দেশে তার বিয়ে হয়েছিল। স্বামী ভাত দেয়নি। এখন মর্জিনা কয়েক মাস অন্তর দেশে যায়। মার জন্য শাড়ি নেয়, বাবার জন্য লুঙ্গি। পুরোন কাপড়ের দোকান থেকে ভাইবোনদের জন্য কাপড়চোপড়ও কিনে নেয়। তার ওপর টাকা পাঠায়। সেখানে সবাই জানে মর্জিনা শহরের বাসাবাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে কামাই করে।

মর্জিনা ক্ষিপ্ত হয়ে কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, শান্তি এসে দাঁড়াল। শান্তির কিছুদিন থেকে অবস্থার আরও উন্নতি হয়েছে। একটা পুরোঘর ভাড়া নিয়েছে সে। শান্তি নতুন শাড়ির আঁচল দুলিয়ে বলল — এই যে ইয়াসমীন বু। আমার একটা চিডি পইড়্যা দেওন লাগব।

ছেরুর দোকানের ঠিকানায় শান্তির মাঝে মাঝে চিঠি আসে দেশ থেকে।

এবার মর্জিনা কণ্ঠ সবল করল — দ্যাখ লো দ্যাখ। আমার মতো আরো কয় জন আছে।

শান্তি চৌকির ওপর বসে পড়ে পোস্টকার্ডটা এগিয়ে দিল ইয়াসমীনের দিকে — বাড়িত থেইক্যা চিডি আইছে। এইডা পইড়া আমারে একখান জবাব লিখ্যা দিবা।

ইয়াসমীন পোস্টকার্ডটা হাতে তুলে নিল। দেশের বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে শান্তির। শান্তির পেছনের ইতিহাসটা মর্জিনার মতোই প্রায়। শান্তির বড় ভাই লিখেছে — মেয়ের বিয়ে। আরো কিছু টাকা পাঠাতে অনুরোধ করেছে। চিঠিটা পড়ে শোনাল ইয়াসমীন শান্তিকে। শান্তি কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল। তারপর ঝংকার দিয়ে উঠল — উঃ। খালি ট্যাকা পাঠাও। কত কষ্টে ট্যাকা কামাই আমরা, তাল তো পায় না। ঘরভাড়া দেও। মাসিরে ট্যাকা খাওয়াও। পুলিশের ঝামেলা। এই বাড়িতে কি শালার কম খরচ।

মর্জিনা নিরীহ মুখে বলল — আহা চাইছে ভাইডা।

শান্তি আপাতত মর্জিনার ওপরেই রুখে উঠল — তরা তো এমুন কথা কবি-ই। যহন আমি রাইতে না খাইয়া ছটফটাইছি, তখন তার বউ একনলা ভাত আউগাইয়া দিছেনি? আমারে হামলাইয়া পোলাপান লইয়া ঘরে দুয়ার দিয়া ভাত খাইছে। মা-বাপ আছিল না। এক ভাই, তাও বউর ডরে কথা কইবার পারে নাই।

শান্তি হঠাৎ চুপ করে গেল। বোধ হয় তার মনে পড়ে গেল গ্রামের বাড়িতে সেই অভাবী

যন্ত্রণাময় দিনগুলোর কথা। বিয়েও হয়েছিল তার সতীনের ঘরে। সেখানেও ছিল সতীন সর্বেসর্বা। তার নালিশ শুনে স্বামী কতদিন ক্ষেতের কাজ থেকে ফিরে শান্তিকে গরু-পেটা করেছে। তারপর একদিন তাড়িয়ে দিয়েছিল বাড়ি থেকে। অসহায় দুঃখী শান্তি বাপের বাড়ি ফিরে এসেছিল। ভাইবউ রণমূর্তি ধরে দূর দূর করে উঠেছিল। বলেছিল — এহানে ক্যান? আমারই বলে সংসার চলে না। তোমার খাওন জোটামু কইথনে? যাও, গতর খাটাইয়া খাও গা।

ভাই দুর্বল কণ্ঠে বলেছিল — আহা যাইব কই? থাউক। আমাগো খুদ-জাউ যা হয় খাইব।

ভাইবউ নরম হয়নি — থাকন কইলেই থাকন! থাকব কই? আমাগো একটা ছাপড়া। পোলাপান লইয়া আমারই থাকনের জায়গা হয় না।

শান্তি করুণ অনুনয়ে বলেছে — ভাউজ, আমি তোমাগো কোনো কষ্ট দিমু না। তোমাগো ভাঙ্গা ঢেহির ঘরটায় ছালা পাইতা রাইতে হুইয়া থাকুম। তোমার পোলাপান খাইয়া যা থাকব, তাই খামু।

শান্তি ভাইর বাড়ি থেকে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকতে পারল কই। ভাইবউর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, তার ওপর খাওয়ার কষ্ট। শান্তি একদিন বাজারে এসে উঠল।

ভাইবউ গাল দিয়ে পাড়া মাথায় করল। ভাই এসে অনুনয় করল — শান্তি, এমুন কইরা আমার জাইত মারিস না।

প্রবল অভিমান আর বিতৃষ্ণা নিয়ে শান্তি গ্রাম ছাড়ল। শান্তি এখন ভেবে অবাক হয়, সেই ভাইকে সে টাকা পাঠায়। ভাই এখন শান্তির টাকায় গঞ্জে মনিহারির দোকান দিয়েছে। অবস্থা ফিরেছে তার। শান্তির ঠোঁটে এক চিলতে বিদ্রূপের হাসি ঝিলিক দিল। এখন বোনের কাছে টাকা চেয়ে চিঠি লিখতে ভাইর জাত যায় না। গ্রামে বড় গলায় বলে, বোন তার স্কুলে আয়ার কাজ করে।

হুরী ভাতের মাড় গালতে গালতে বলল — কী লো শান্তি, চিঠি পড়াইবার আইয়া দেহি বোবা হইয়া গেলি!

শান্তি ধাতস্থ হলো; ঝনঝনে কণ্ঠে বলল — তুমি লেইখ্যা দিবা বুজি, এত টাকা আমি দিবার পারুম না।

একটু থেমে আবার বলল — লেখছে মাইয়াডার বিয়া ঠিক হইছে, পোলাডা ভালো। জমিজিরাত আছে, তাই এট্টু ভাবি — আমার তো কপাল গ্যাছে। অগে কপাল ভালা হউক।

হঠাৎ দরজায় তাকিয়ে শান্তি সটান হয়ে দাঁড়াল। একজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে গলির মধ্যে, ওদের ঠিক দরজার সামনে। এ সময়টায় অনেক মেয়েই খরিদ্দার নেয় না। আবার অনেকেই নেয়। লোকটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। মর্জিনা, হুরী সবাই সচকিত হলো।

ওদের অবয়বে একটু আগের ঢিলেঢালা ভাব কেটে চটুল বনিতার উচ্ছলতা জেগে উঠল। মর্জিনা ঠোঁটে রঙিন হাসি ফুটিয়ে বলল — দিনে আইছ যে নাগর?

হুরী হেসে গড়িয়ে পড়ল — এই গলিতে রাইতে আইতে বহুত বাবু সাবেগো ডর করে।

লোকটা সোজা চোখে তাকাল — ইয়াসমীন কে?

সবার চোখে চোখে ইশারা খেলে গেল। ইয়াসমীন উঠে দাঁড়াল। ময়না জাহানআরার জন্য চা কিনে নিয়ে যাচ্ছিল। লোকটাকে দেখে থামল। চেঁচিয়ে বলল — এই যে বাবু! এহানে ক্যান? জাহানআরার ঘর তো দোতালায়। ঘর ভুল হইছে নাকি?

লোকটা মুখ ফিরিয়ে বলল — আমি জাহানআরার কাছে আসিনি।

ময়না তাজ্জব হবার ভঙ্গি করল — ও মা! এইডা কেমুন কথা। তুমি না হেইদিন আইছিলা! জাহানআরার ঘরে বিলাতি মাল খাওয়াইয়া গ্যালা?

লোকটা একটুক্ষণ ময়নাকে দেখে বলল — আজ আমি ইয়াসমীনের কাছে এসেছি।

সবাই চমকাল। জাহানআরার খরিদ্দার এসেছে ইয়াসমীনের কাছে। এও কি সম্ভব! জাহানআরার খরিদ্দারের চুলের গোছাটি পর্যন্ত স্পর্শ করবার দুঃসাহস এ পাড়ায় কারো নেই। আর এ কথাও সবাই জানে, ইয়াসমীনের কাছে যে খরিদ্দার একবার আসে, সে খরিদ্দার পরদিন এলে ভুলেও ইয়াসমীনের নাম উচ্চারণ করে না। ব্যাপারটা সবার কাছেই রহস্য।

কেবল মাসি বলে — ল্যাখাপড়া জানা মাইয়া তো, ব্যাশ্যাগো মতো শরীলের বাজার বহাইবার পারে না। আরে মানুষ তো মুখ বদ্□লাইবার আহে। অমুন শক্ত হইয়া থাকলে পুরুষ কি পছন্দ করে হেই মাইয়া?

ময়না চলে গেল। ইয়াসমীন এগিয়ে এলো দরজায়। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা দীর্ঘকায় লোকটাকে অপাঙ্গে দেখে বলল — আমি ইয়াসমীন। আমার নাম তুমি জানলে কী করে?

লোকটাও দেখল ইয়াসমীনকে। অল্প হাসল — নাম জানতে কি অসুবিধে আছে এ পাড়ায়!

ইয়াসমীনের মুখের রেখা কঠিন হলো — দিনের বেলা লোক নিই না আমি।

লোকটা আবার হাসল — যদি বলি আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি।

ইয়াসমীন চমকে উঠল। আপনি করে সম্বোধন করছে লোকটা তাকে। কী চায় এ লোক!

শান্তি চলে গেল। যাবার সময় বলল — তুমি লোক বহাও বুজি। আমি পরে আসুম।

মর্জিনা মাংসের হাঁড়িতে সুরুয়া ঢেলে দিল। হুরীর ভাত রান্না হয়ে গেছে। ভাতের ডেকচিটা তক্তপোষের তলায় ঠেলে দিয়ে সেও উঠে দাঁড়াল। মর্জিনা বলল — আমরা বাইরে যাই, তুমি ঘরে আনো মানুষ।

মর্জিনা, হুরী বেরিয়ে গেল। ইয়াসমীনকে ওরা ঈর্ষা করে না। ইয়াসমীনের খরিদ্দার এমনিতেই যথেষ্ট নয়। তার ওপর মর্জিমাফিক ব্যবসা করে সে। ঠিকমতো ঘরভাড়া দিতে পারে না। ভাত খাবার পয়সা জোটে না। তবু একটানা দু'চারদিন কোনো লোক বসায় না সে। লোকটা বলল — চলুন ঘরে গিয়ে বসি। দাঁড়িয়ে আলাপ হয় না।

ইয়াসমীন ঘরে এলো। লোকটাও এলো পেছন পেছন। নিজেই টেনে দরজা ভিড়িয়ে দিল। ইয়াসমীন সরাসরি তাকাল লোকটার চোখে — আমি তো বলেছি দিনে লোক নিই না আমি।

লোকটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরাল — শুনেছি আপনি লেখাপড়া জানেন। বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই আমার আসাটা আর-দশজনের মতো নয়।

ইয়াসমীন চুপ করে রইল। লোকটা ততক্ষণে স্যাঁতসেঁতে নোংরা ঘরটার চারদিকে দৃষ্টি বুলাচ্ছে। ঘরের এককোণে মর্জিনার টিনের ট্রাংক। তার ওপর হুরীর রংচটা একটা এয়ারব্যাগ, দড়িতে ঝুলছে ওদের আধ-ময়লা শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, ব্রেসিয়ার, গামছা। ঘর ভরে ছড়িয়ে রয়েছে রান্নার মসলার কৌটা, বঁটি, মাটির গামলা এবং তেলের কৌটা। কোটা মাংসের পরদা, বাতিল টুকরো ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে মেঝেতে। মেঝেটা পানি পড়ে কাদা হয়ে গেছে। মর্জিনার কেরোসিনের চুলায় মাংস রান্নার সুঘ্রাণ আসছে। তক্তপোষের একপাশে স্তূপ-করা ছেঁড়া তোশক, তেল চিটচিটে কাঁথা-বালিশ। লোকটা চোখ তুলল — এ ঘরে থাকেন আপনি?

লোকটার কণ্ঠের বিস্ময়কে আমল দিল না ইয়াসমীন — কেন, ঘরটা কি খারাপ?

— না। মানে এইটুকু ঘর... এমন স্যাঁতসেঁতে। দম বন্ধ হয়ে আসে।

ইয়াসমীন শব্দ করে হাসল — তবু তো এসব ঘরে আপনার মতো লোকেরা মেয়েমানুষের শরীর কিনতে আসে।

চমকে চোখ তুলল লোকটা। একটু থেমে বলল — এত কষ্ট করে থাকতে হয়!

ইয়াসমীন ঠোঁট বাঁকাল বিদ্রূপে — আপনি কি ভেবেছিলেন যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মতো বারবনিতার ঘরে হারমোনিয়াম, তবলা, মদের বোতল, আলমারি এসব দেখবেন?

একটু থেমে ঝকঝকে দৃষ্টিতে তাকাল ইয়াসমীন — আপনি রাজলক্ষ্মী চন্দ্রমুখীর মতো কাউকে খুঁজছেন বুঝি? বিমল মিত্রের নায়িকা? আসলে...

ইয়াসমীন থেমে গেল। লোকটা ঝুঁকে এলো ইয়াসমীনের দিকে — বলুন, কী বলতে চাচ্ছেন। আসলে কী?

ইয়াসমীন ক্লান্ত কণ্ঠে বলল — না। কিছু না।

— না বলুন আপনি। আমি শুনতে চাই।

ইয়াসমীন একদৃষ্টিতে তাকাল লোকটার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে দৃষ্টি নামিয়ে নিল হতচ্ছাড়া ঘরের শ্রীহীন মেঝেতে — আসলে পুরুষেরা এসব মেয়েকে রঙ্গিনী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। তারাশংকরের বসন্ত চরিত্র তো খুব চমৎকার, তাই না! কিন্তু তার কি যন্ত্রণা ছিল না? তার কি দুঃখ ছিল না? বলতে পারেন সে, তারা, আমরা এ বাড়ির সবাই আমরা শুধু মেয়েমানুষ কেন? আমরা তো মানুষ। আপনাদের স্ত্রী-কন্যা-বোনের মতো মানুষ।

লোকটার হাতে সিগারেট পুড়তে পুড়তে আঙুলের ডগা ছুঁয়েছে। ইয়াসমীনের যন্ত্রণা প্রতিফলিত মুখের দিকে বেদনাহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে।

ইয়াসমীন সহজ হলো। মুখে হাসি ফোটাল — আপনি যখন এসেছেন আপনাকে ফেরাব না। এও বলি আমার কাস্টমার আমাকে নিয়ে খুশি হয় না। অনেকে গালাগাল দেয়। অনেকে টাকা ফেরত চায়। কেন চায় জানেন?

ইয়াসমীন একটু অন্য রকম হাসল — মানুষের ভেতর একটা পশু বাস করে। সে পশুটার চাহিদা বড় বন্য। আমাদের মতো মেয়েদের কাছে যেসব কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি, যেসব উত্তেজনার কথাবার্তা লোক আশা করে, তা আমার কাছে পায় না। ওটা এখনও রপ্ত করতে পারিনি, বুঝলেন?

স্তম্ভিত লোকটা এতক্ষণে মুখ খুলল — আপনি এ পাড়ায় কেমন করে এলেন? আপনি তো এখানে বেমানান। মনে হয় আপনি অনেক লেখাপড়া জানেন।

ইয়াসমীনের মুখ কঠিন হলো — যেমন করে আর-দশটা মেয়ে এসেছে তেমন করেই এসেছি। আপনাদের দৃষ্টিহীনতা প্রতিদিন কত মেয়েকে এই অন্ধকার জীবনে ঠেলে দিচ্ছে, তা নিয়ে কি আপনাদের কেউ মাথা ঘামায়?

ইয়াসমীন থামল। আবার কথা বলল — এবার প্রশ্ন করতে পারি আপনি কে? কী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন?

লোকটা পোড়া সিগারেট ফেলে দিয়ে আবার নতুন সিগারেট ধরাল — আমি একজন লেখক। সাংবাদিকও। আমার নাম দেলোয়ার হোসেন।

ইয়াসমীন উঠে গিয়ে মর্জিনার তরকারিটা নেড়ে দিয়ে চুলোর জ্বাল কমিয়ে দিল। তারপর ঘুরে দাঁড়াল — ও বই লেখার পট খুঁজতে এসেছেন তাহলে! উদ্দেশ্য ছাড়া এই গলিতে কেউ ঢোকে না। বেশ তো, আমাদের নিয়ে বই লেখেন। লোকে নাক সিটকাবে আবার পড়বেও। বিশেষ করে বাইরে যারা অবসিনিটি নিয়ে চেঁচামেচি করে আবার ভেতরে ভেতরে পর্নোগ্রাফির ছবি গোগ্রাসে গেলে। ভালো বিক্রি হবে। ভালো পয়সা পাবেন।

দেলোয়ার অল্প হাসল — যদি বলি আমি আপনাদের দুঃখটাই সমাজে তুলে ধরতে চাই।

ইয়াসমীন প্রচণ্ড জোরে হেসে উঠল — বইয়ের আদর্শবান নায়কদের মতো কথা বলছেন। যেমন বলে সিনেমার হিরোরা সেলুলয়েডের পর্দায়।

ইয়াসমীনের প্রচণ্ড হাসির ঝাপটায় দেলোয়ার চমকে উঠেছিল।

ইয়াসমীন ততক্ষণে হাসি থামিয়ে নিষ্পলকে তাকিয়ে আছে দেলোয়ারের দিকে। তার সারামুখ থেকে আলোর দ্যুতির মতো ঘৃণার আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। হাত দুটো দিয়ে অকারণে শক্ত চৌকির কাঠের ওপর আঁচড় কাটতে কাটতে কথা বলল ইয়াসমীন — সমাজ কাদের নিয়ে? যারা এখানে বেশ্যার ঘরে উত্তেজনা কিনতে আসে, তারা কি সমাজের বাইরের মানুষ? যারা বেশি পয়সা দিয়ে সুন্দরী বেশ্যাদের গাড়ি চড়িয়ে এখান থেকে বাইরে নিয়ে যায়, তারা সমাজের মানুষ নয়? আর যারা আমাদের লাইসেন্স কেনার টাকা তোলে তারা এ সমাজের বাইরে? সেই আয় সরকারি আয় হয়ে যখন সবার পাতে পড়ে? আমি যদি বলি আমাদের পয়সা আছে ওই পয়সায়, যে পয়সায় একজন মন্ত্রী সরকারি গাড়ি চড়ে নতুন কারখানার দরোজার ফিতে কাটতে যায়।

দেলোয়ার বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ইয়াসমীনের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল — আপনার নাম শুনে এসেছিলাম। আপনার কথা যত শুনছি অবাক হচ্ছি। আপনি কেন এই নরকে বুঝতে পারছি না।

দেলোয়ারের বিস্মিত দৃষ্টি থেকে মুখ ঘুরিয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে রইল ইয়াসমীন। তারপর ধীরে ধীরে বলল — আমাকে কেন প্রশ্ন করছেন? জিজ্ঞাসা করুন বাইরে সবাইকে। প্রশ্ন করুন আপনার ওই ভণ্ড মুখোশধারী সমাজকে। যে সমাজটার শরীর পচে

গলে কুষ্ঠব্যাধির মতো ঘা দগদগ করছে। আমি তাকে ঘৃণা করি। আমি আপনাদের মতো সব ভদ্রলোককে ঘৃণা করি।

— কিন্তু এখানে কি আপনি সুখে আছেন?

— সুখ! যে সমাজে মানুষের স্বাধীনতা নেই, যে সমাজে সবাই অদৃশ্য শৃঙ্খলে বন্দি সেখানে কে সুখে আছে। এখানে তবু ভানের পর্দা নেই। মানুষ নামের পশুদের মুখ এখানে মুখোশ-ঢাকা নয়।

দেলোয়ার দ্রুতহাতে আর একটা সিগারেট ধরাল — মাথা নিচু করে সব মেনে নিলেই কি চলবে? প্রতিবাদ কি করা যায় না?

ইয়াসমীন চমকে মুখ তুলল — কে করবে প্রতিবাদ?

— কেন! আমি-আপনি। আপনার-আমার মতো আরো দশজন। মনে করুন এ পাড়ারই মেয়েরা। যারা চরম অন্যায়ের শিকার।

ইয়াসমীনের ঠোঁটে আবার বিদ্রূপ ঝিকিয়ে উঠল — আপনি বুঝি রাজনীতি করেন? রাজনীতিবিদরা অনেক গালভরা বক্তৃতা দেয় আমি জানি। ছাত্রজীবনে আমিও রাজনীতি করেছি। এখন আমার হাসি পায়। খবর কাগজে আপনাদের সরকারের বড় বড় রদবদলের কথা যখন পড়ি আমার হাসি পায়। বলতে পারেন, আপনাদের যে সরকারই যখন দেশ শাসন করেছে এই সব পাড়ার মেয়েদের কথা তাদের মনে পড়েছে? তারা কি একবারও ভেবেছে যারা এ দেশেরই মানুষ, যাদের একদিন স্বাধীন নাগরিক হিসেবে জন্ম হয়েছিল, তারা কী নির্মম-নিষ্ঠুর অত্যাচারের মধ্য দিয়ে কতগুলো নির্বোধ অসহায় পশুর মতো জীবন কাটাচ্ছে। তাদের বর্তমান যন্ত্রণার, তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তাদের নিয়ে কে ভেবেছে?

ইয়াসমীন একটানা কথা বলে হাঁফাতে লাগল।

দেলোয়ার নিস্তব্ধ।

বাইরে থেকে মর্জিনা দরজায় ধাক্কা দিল — ও বু, আমার তরকারিডা বুঝি পুইড়্যা গেল। তোমাগো হইছে?

ইয়াসমীন উঠল — আপনি কি এখন যাবেন?

দেলোয়ারও উঠল — আপনাকে আমার এত পবিত্র, এত নিষ্পাপ মনে হচ্ছে।

ইয়াসমীন দরজা খুলে দিল — মানুষ মাত্রই নিষ্পাপ। পরিবেশেই পাপ থাকে। অবশ্য

আপনার সমাজের পাপ-পুণ্যের বিচার কী তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন।

দেলোয়ার বলল — আবার আসব, আপনার কাছে আমাকে আসতেই হবে।

ইয়াসমীন ঠোঁট টিপে হাসল — পুরুষ হিসেবে?

— না, মানুষ হিসেবে।

দেলোয়ার বেরিয়ে যাচ্ছিল। মর্জিনা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মুচকি হাসল — ইয়াসমীন বু'র ঘরে তো কোনো মানুষ এতক্ষণ থাকে না। কত ট্যাকা দিয়া গেলা গো নাগর?

দেলোয়ার একটু চমকাল। পকেট থেকে দুটো নোট বের করে ইয়াসমীনের দিকে কুণ্ঠিত হাতে বাড়িয়ে ধরল — কিছু মনে করলেন না তো?

ইয়াসমীন অন্যরকম হাসল — মনে করব কেন? আমাদের কাছে লোকে টাকা নিয়েই তো আসে।

নির্দ্বিধায় টাকাটা তুলে নিল ইয়াসমীন — আসবেন আবার। খুশি হব।

দেলোয়ার বেরিয়ে যেতে যেতে বলল — আমি আপনার বন্ধু হয়ে আসব।

দেলোয়ার চলে যেতে মর্জিনা, হুরী, শান্তি এসে ঘিরে ধরল ইয়াসমীনকে। হুরী বলল — বাবু দেহি মোটা ট্যাকা ফালাইয়া গেল। ব্যাপারখান কী ইয়াসমীন বু? রাতারাতি রেট বাড়াইলা নি?

ইয়াসমীন জবাব না দিয়ে মুচকি হাসল। একটা দশ টাকার নোট মর্জিনাকে দিয়ে বলল — এই নে। তুই ঘরভাড়া দেবার সময় আমাকে দশ টাকা ধার দিয়েছিলি।

মর্জিনা টাকাটা আঁচলে বেঁধে তরকারি নামাতে বসল। ইয়াসমীন শান্তিকে বলল — আচ্ছা শান্তি, মনে কর এ পাড়াটা যদি একদিন বন্ধ হয়ে যায়!

শান্তি আঁতকে উঠল — কও কী বুজি! আমরা কই যামু? কী খামু? আলাইবালাই! কী কথা কও তুমি?

হুরী ঠিকা মাসিকে দিয়ে এক কলসি পানি কিনেছে। দড়ির ওপর থেকে ব্লাউজ, পেটিকোট তুলে কয়লার গুঁড়ো দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে বলল — ইয়াসমীন বু! তুমি কী কও! বেশ্যাপাড়া আবার বন্ধ হইবার পারেনি!

ইয়াসমীন হাসল — পারে না কেন? পারে।

হুরী বিজ্ঞভঙ্গিতে বলল — বুঝছি। খবর কাগজে খবর আইছে বুঝি! আরে আমিও কইয়া

থুইলাম এ-ব্যবসা কুনোদিন বন্ধ হইব না। বন্ধ করব কারা?

মর্জিনা তরকারি নামিয়ে চুলা নিভিয়ে দিল — নেও নেও। সবই তো জানা আছে। ব্যাশ্যার বাজার সবতেই চায়।

হুরী বলল — হেই যে একবার আইয়ুব খান বাদশাহর সময় আইন হইল বেশ্যাপাড়া থাকব না দ্যাশে। আমি তহন বুড়িগঙ্গার পাড়ের পাড়ায় থাকি। পুলিশ আইয়া ঘিরা ফালাইল পাড়া। ওরে ভাঙচুর। আর মরামুইখা পুলিশরা তার মধ্যেই একদল ম্যায়াগো ঘরে বইসা গেল। কত খুন-খারাবি, মাইরপিট।

মর্জিনা ভ্রূ বাঁকাল — হইল ডা কী?

হুরী জোরে জোরে দাঁত ঘষে দরজার সামনে কালো একদলা পিক ফেলে বলল — হইল আর কি। কোট-কাচারি থিকা কইল খাতায় আর নাম উঠাইব না। মাঝখান থিকা ম্যায়ারা ছিটাভিটা পড়ল এহানে-ওহানে। ভাতের দুঃখু, এহানে-সেহানে হাইটা কাস্টমার ধরন। না বাবা এই আমরা ভালো আছি।

ইয়াসমীন হুরীর দিকে তাকাল — কেন, আমি-তুই-আমরা সবাই আর দশজন যেমন ঘর-গৃহস্থালি করে খাচ্ছে, অফিস-আদালত করছে তেমন করতে পারি না?

শান্তি হেসে গড়িয়ে পড়ল — বেশ্যার আবার ঘর-গিরস্থালি। বেশি বই পইড়া মাথা ঠিক নাই তোমার ইয়াসমীন বু। গতরে একবার ছাপ লাগলে আর কি উঠে?

হুরী মুখ বাঁকিয়ে বলল — ছ্যাপ দেই মরার ঘর-গিরস্থালির কপালে। এই আছি ভালো। আমি হাচা কথা কই, একজন মানুষ লইয়া রাইত কাটানের কথা মনে হইলে আমার গতর ঘিনায়। দশজন পুরুষের দশরকম স্বোয়াদ।

মর্জিনা ঠাট্টা করে ঠোনা মারল হুরীর গালে — ওরে আমার জাত বেশ্যা মাগি রে। তয় আমিও কই, এই পাড়ায় যহন বইছি তহন এহানেই মরুম। বাইরের দুনিয়ায় যা খুশি হউক, আমাগো কী তাতে।

শান্তি বলল — বাইরে আমাগো জায়গা দিব ক্যাডায়! বাইরের বিবিরা তো আমাগো কুষ্ঠরুগীর চাইয়া বেশি ঘিন্না করে।

ইয়াসমীন দমল না — তোরা নিজেদের কেবল বেশ্যা ভাবিস কেন? মানুষ ভাবতে পারিস না?

শান্তি, মর্জিনা, হুরী একসঙ্গে হেসে উঠল। শান্তি বলল — তোমার কথা সব আমরা বুঝি না বু। তয় এইডাও কই, ওই যে ওই ঘরের মতি খুব তো দেমাগ দেহাইয়া পাড়া ছাইড়া গেছিল। কইছিল 'এই দোজখে আর আহুম না। দ্যাশে যাইয়া বাড়া বাইনা খামু তাও ভালো।' থাকবার পারল কই? দুই মাস না যাইতেই তো আবার ফির□্যা আইল। গেরামের মানুষের জ্বালায় অস্থির হইয়া আইয়া পড়ল। এহন কও তুমি কী কইবা?

ইয়াসমীন কিছুক্ষণ জবাব খুঁজে পেল না। মনের মধ্যে এই অশিক্ষিত বারবনিতাদের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে লাগল।

ওদের কেমন করে বোঝাবে যে সমাজের সৃষ্ট একটা ক্ষতের মধ্যে ওরা বাস করছে। ওরা শরীর বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু একে বাঁচা বলে না।

শান্তি ইয়াসমীনের খুব কাছে এসে বলল — হাছা কথা কও দেহি, গরমেন্ট কি আইন করতাছে নাকি, বেশ্যাপাড়া উঠাইয়া দিব?

ইয়াসমীন মাথা নাড়ল — না। সেরকম কিছু শুনিনি।

হুরী আবার এক খাবলা থুথু ফেলে এলো — তয় আর চিন্তা কী?

ইয়াসমীন কিছুক্ষণ ওদের মুখ দেখল। যতই ছলা-পটীয়সী মুখরা হিংস্র স্বভাবের ছাপমারা মেয়েমানুষ হোক না, এই মুহূর্তে ওদেরকে অজ্ঞ, নির্বোধ শিশু ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না যেন। ইয়াসমীন মর্জিনাকে বলল — একটা সিগারেট দে তো।

ইয়াসমীন এ পাড়ার মেয়েদের মতো যখন-তখন সিগারেট খায় না। মদ খাওয়ার আবদার ধরে না খরিদ্দারের কাছে। মর্জিনা দ্রুত হাতে সিগারেট বের করে ধরিয়ে দিল ইয়াসমীনের হাতে।

॥ ৫ ॥

গলির ওদিক থেকে মাসির কণ্ঠ শোনা গেল — ওই মাইয়ারা। কই গেলি সব। কাজীসাব আইছে। আয় আয় জলদি আয়। আয় সব। ভাড়ার ট্যাকা দিয়া যা।

ষাট বছরের কাজী সাহেবের পরনে লম্বা কুর্তা আর লুঙ্গি। দাড়ি সাদা ফুরফুরে। মাসির পাশে টুলে বসে কাজী সাহেব কথা বলছিলেন। মেয়েরা কেউ কেউ তার পায় হাত দিয়ে কদমবুসি করল। কাজী সাহেব নিমীলিত চোখে আলোকদীপ্ত হাসি ফুটিয়ে দোয়া করলেন

— সুখে-শান্তিতে থাকো।

মাসির সঙ্গে কাজী সাহেবের অনেক দিনের আলাপ। অনেক পুরোনো দুর্মুখরা বলে, কাজী সাহেব নাকি বয়সকালে মাসির বাঁধা খরিদ্দার ছিলেন। এখন দুনিয়াদারি ছেড়েছেন। কিছুদিন আগে ঘরের ভাড়া তুলতে এসে কাঞ্চনের সঙ্গে গল্প করছিলেন তিনি — বুঝলা কাঞ্চন মিয়া! দুনিয়ায় আমার টান নাই। বয়সও তিনকাল কাটাইলাম। হাদিসে আছে সংসার করণ সুন্নত। তাই সংসারধর্ম ছাড়তে পারতেছি না।

শুধু কাঞ্চন কেন, এ পাড়ার সবাই জানে কাজী সাহেব সংসারধর্মটা ভালোই পালন করছেন। অবশ্য তা কীভাবে; সে সম্পর্কে ধর্ম-জ্ঞানশূন্য এ পাড়ার অধিবাসীরা ওয়াকিবহাল নয়। পুরোনো ঢাকায় কাজী সাহেবের টায়ার-টিউব-সাইকেল পার্টসের দোকান আছে। চকবাজারে একটা গুদাম আছে। তাছাড়া এরকম দু-তিনটা নিষিদ্ধ পল্লীতে ঘর ভাড়া দিয়েও কামাই তার মন্দ হয় না।

মাসি আত্মীয়তার সুরে কাজী সাহেবকে প্রশ্ন করল — পোলা-মাইয়ারা কেমুন আছে সব?

কাজী সাহেবের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হলো — আছে সব ভালোই। বড় মাইয়াডার বিয়া দিছি জান তো! জামাই ডাক্তার। রুজি-কামাই ভালোই। ছোট মাইয়াডা কলেজে যায়। এইবার বিএ পরীক্ষা দিব। অর মায় কয় এইডারে তাড়াতাড়ি বিয়া দিয়া কাম নাই। এম এ পাস কইরা বলে কলেজের মাস্টারনি হইব।

কাজী সাহেবের হাসি বিস্তৃত হলো — বড় পোলাডা কারবার দেখে। আমি আর কয় দিন। আইজ আছি কাইল নাই। তাগো জিনিস তারাই বুইঝা লউক। ছোট পোলাডারে দিছি ইঞ্জিনিয়ার হইবার।

মাসি বলল — পোলা-মাইয়ারা পট্টির ঘরভাড়ার খবর জানে নিকি?

কাজী সাহেবের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো — আরে তওবা, তওবা। কস কী সতী! এই কথা কি অগো কইবার পারি! আইজকালকার ল্যাখাপড়া জানা পোলাপাইন। কী বুঝতে কী বুঝব! এই ব্যবসা উঠাইয়াই দিতাম। খালি দেই না আমার উছিলায় কয়জন মাইয়ার রুজিকামাই জুটতে আছে। মাইয়াগুন থাইকা প্যাটের ভাত কামাইতে আছে। কম রেটে ঘর ভাড়া দেই আমি। আর কেউ নিলে তো ডবল চার্জ বসাইত।

বকুল টাকা হাতে এসে দাঁড়িয়েছিল সবার আগে। একসপ্তাহের ভাড়া কাজী সাহেবের সামনে মেলে ধরে বলল — চাচাজান, ঘরটা দিয়া বর্ষার পানি পড়ে। জবর কষ্ট হয়। পানি পড়লে কাস্টমার বইবার চায় না। যদি একটু ঠিক কইরা দ্যান। ম্যাঘের দিন তো আইয়া গেল।

কাজী সাহেবের মুখে নিভাঁজ হাসি — কী করবা মাইয়া। একটু কষ্ট কইরা থাক। ঘর নাড়া দিতে গেলে তো পুরো বাড়িটাই ভাঙন লাগব। হেইডা কি আমি একলা পারি। কও, তোমরাই কও?

শান্তি, হুরী, মমতা পাশে দাঁড়িয়েছিল। কাজী সাহেব বকুলের হাত থেকে নোটগুলো তুলে নিয়ে গুনে দেখতে দেখতে ওদের দিকে একপলক তাকিয়ে বললেন — কি মাইয়ারা! তোমাগো কী খবর?

সবাই যার যার ঘরভাড়া বের করে টাকা গুনছে। মমতা এদের মধ্যে কমবয়সী। একটু উদ্ধতও। কাজী সাহেব মমতার দিকে চোখ রাখলেন — কিরে! শুনলাম তুই নাকি আমার ঘর ছাইড়া দিবি?

মমতা ঝনঝনে উত্তর দিল — দিমু তো। আপনের ভাঙ্গাঘরের ভাড়া তো কম না। এই যে নেন আপনের ট্যাকা। দশ টাকা কম আছে।

কাজী সাহেবের কপালে আঁকাবাঁকা কয়েকটা রেখা ঢেউ তুলল — কম আছে? ক্যান কম থাকব? আমার ঘরে তুই রাইতে মানুষ বসাস না?

মমতা নীরস উত্তর দিল — কী করুম, ট্যাকা না পাইলে কই থিকা দিমু আপনেরে!

মাসি ধমকে উঠল — ঠাস ঠাস কথা কইবার তো শিখছস। দর্জি দিয়া দেহি বাহারের জামাকাপড় বানাইয়া পিন্দা ঘোর। সিনেমা দেহনের কামাই নাই। তয় ঘরের ভাড়া দিবার পারস না ক্যান লো? ফালা, ট্যাকা ফালা।

মমতা ঘাড় বাঁকা করে বলল — দিয়া দিমু। সামনের সপ্তাহে মাসির হাতে দিয়া দিমু।

কাজী সাহেব অসন্তুষ্ট মুখে মাসির দিকে ফিরলেন — সতী তরে আমি কইয়া যাই, আমার ঘরের রোজকার ভাড়া তুই রোজ উঠাইয়া রাখবি। তর হাতেই তো ভাড়া উঠানের ভার দিয়া দিছি।

মাসি ঝংকার দিল — আমারে ভার দিছ তাই কইয়া আমি কি তোমারে ঠকাই?

ঠিকমতো তো ট্যাকা উঠাইয়া দেই। দু'চারজন বাকি ফালায়, তুমি টুক টুক কইরা আইয়া হাজির হও।

কাজী সাহেব হাসলেন — এই তো ক্ষেইপ্যা গেলি। আরে তরে কি আমি অবিশ্বাস করি? এত বছর তগো দেখতে আছি। নিজে আহি টাকা উঠানের উছিলায়। দেইখাও যাই তরা কেমুন আছস না আছস। এই মাইয়াগো লিগা বুকে কি আমার দরদ কম! আমার উছিলায় তো অগো খাওন জুটায় আল্লায়।

মমতার দিকে তাকিয়ে নরমকণ্ঠে বললেন কাজী সাহেব — শোন ট্যাকাটা ঠিকমতো মাসির হাতে দিয়া দিস। তরা বোঝস না ক্যান যে আমার উছিলায় তগো থাকন-খাওনের ব্যবস্থা হইছে। দুনিয়াডার খবর তো রাখস না। মানুষের কত কষ্টে দিন কাটতে আছে। আমি কম ভাড়ায় ঘর না দিলে কই যাইতি গা সব ভাইস্যা।

সবাই ঘরভাড়ার টাকা বুঝিয়ে দিয়ে সরে গেল। অনেকে ভাবল, সত্যি কাজী সাহেব লোকটা ফেরেশতার মতো। মেয়েদের জন্য কত দরদ। কী সুন্দর কথা। সত্যিই তো এরকম লোকেরা ঘরভাড়া না দিলে তারা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত! ভিক্ষে করে খেতে হতো, নয়তো পথের ধারে না খেয়ে পড়ে মরতে হতো। আর যে কী হতো তারা তা ভাবতে পারে না। আর কাজী সাহেব তো অন্যঘরের মালিকদের মতো নিষ্ঠুর নয়। মেয়েদের মেরেপিটে ঘরের পয়সা আদায় করে না।

কাজী সাহেব মাসির দিকে তাকিয়ে বললেন — তোমার ফুলমতী বিবিজানের খবর কি? পোলা তো একটা বিয়াইয়া বইছে। ঘরখান তো তারে আমি মাগ্না দেই নাই।

মাসী নিচুকণ্ঠে বলল — ছেড়িটার কপাল খারাপ। শুকাইয়া পাটখড়ির নাগাল হইয়া গেছে। ওর কাছে মানুষ বইব কি!

কাজী সাহেব শক্ত হলেন — তার আমি কী জানি। ভাড়া দিবার না পারলে ঘর ছাইড়া দেউক। পথে পথে হাইটা পোলা লইয়া ভিক্ষা

কইরা খাউক। আমার ঘরে তো আমি লোকসান দিবার পারি না। ডাক দেহি ফুলমতীরে।

কে যেন গিয়ে ফুলমতীকে ডেকে আনল। ছেলে কোলে নিয়ে কুণ্ঠিতভাবে ফুলমতী এসে দাঁড়াল সামনে। ফুলমতীর দুঃখী, অভুক্ত চেহারাটা বোধ হয় কাজী সাহেবের চোখে পড়ল

না। তিনি দেখতে পেলেন না ওর চোখের নিচে কালি পড়ে চোয়ালের হাড় দুটো বিশ্রীভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। মুখের চারপাশে তেলের স্পর্শবিহীন রুক্ষ লাল চুল ছড়িয়ে রয়েছে। গায়ে জামা নেই। পরনের শাড়ি বিবর্ণ ময়লা। তেলচিটে আঁচলটা মাথায় তুলে অপরাধী ভঙ্গিতে ফুলমতী দাঁড়িয়ে আছে। বাচ্চাটা প্রাণপণে মায়ের শুকনো বুক চুষছে।

কাজী সাহেব হুঙ্কার ছাড়লেন — কিরে মাগি! কবে ঘর ছাড়বি! আইজ একটা মাস আমার ঘরের ভাড়া দেস না।

ফুলমতী পায়ের বুড়ো আঙুল ঘষল মাটিতে — আর কয়ডা দিন আমারে সময় দ্যান চাচা। বাচ্চাডার অসুখ।

কাজী সাহেব মুখ ভেংচে উঠলেন — বাচ্চার অসুখ! ক্যান বাচ্চা বাধানের সময় মনে আছিল না? বেশ্যার আবার বাচ্চা কীরে?

ফুলমতী মিনমিন করল — কী করুম। ফালাইবার তো পারি না।

কাজী সাহেব আরো রেগে গেলেন — ক্যান মান্নানের দোকানে বড়ির কি আকাল লাগছে? বড়ি কিনা খাইবার পারস নাই? ওইসব আমারে শুনাইবার আবি না। ঘরের ভাড়া ফালা, না হইলে ঘর ছাইড়া দিয়া যাগা হাইটা।

ফুলমতী হঠাৎ কাজী সাহেবের পায়ের কাছে বসে পড়ে হুহু করে কেঁদে উঠল — চাচাজান! আপনে বাপের নাগাল। আপনের ভরসায় আমরা আছি। নিদানে ঠেইলা ফালাইয়া দিবেন?

মাসি ধমকে উঠল — চুপ থাক মাগি। ভঙ্গির কান্দন কান্দা লাগব না। বাচ্চা লইয়া কেউ এই পাড়ায় আর ব্যবসা করে নাই?

ফুলমতী কাঁদতে লাগল — কী করুম। বাচ্চাডার ব্যারাম ছাড়ে না। নিজে খাইবার পাই না। বাচ্চারে খাওয়াইবার পারি না। একটা ফোঁটা ওষুধ দিবার পারি না মুখে। বাচ্চাডারে চাচা আপনে লইয়া যান। দিয়া দেন কেওইরে।

কাজী সাহেব ঠোঁট কুঁচকালেন — হঃ তগো জাউরা-তাউরাডা লইয়া আমি হাত নাপাক করি! শোন মাগি! সামনের সপ্তাহে সব ভাড়া বুঝাইয়া দিবি। না হইলে হীরু গুণ্ডারে পাঠামু। তর আর তর বাচ্চার পেটে পাড়া দিয়া টাকা আদায় করব। তগো মতো খানকি মাগির পয়সা ক্যামনে আদায় করণ লাগে আমি জানি না বুঝছস!

ফুলমতী চোখ তুলল। চোখের পানি গড়িয়ে বাচ্চার শরীরে পড়ছে। কাজী সাহেব ধমক দিলেন — যা, উইঠা যা আমার সামনে থিকা।

ফুলমতী উঠে গেল। একটু আড়ালে গিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষল — খবিশ হারামখোর বুইড়্যা। গজব পড়ুক তর গুষ্টির ওপর। নির্বংশ করুক আল্লায় তরে।

কাজী সাহেব উঠলেন — আমি এইবার উঠি রে সতী। যাওনের সময় বড় মাইয়ার বাসা হইয়া যামু। মাইয়াডার শরীর ভালো না।

মাসি প্রশ্ন করল — কী হইছে মাইয়ার?

কাজী সাহেবের চেহারা আবার সুপ্রসন্ন হলো। বাৎসল্যের হাসি ছড়িয়ে পড়ল ঠোঁটের কোণে — নাতি-পুতি আইতাছে। মাইয়া কিছু খাইবার পারে না। যাওনের সময় দই কিনা লইয়া যামু এই ট্যাকা দিয়া।

মাসি উচ্ছল হলো — তাইলে সুখবর। মাইয়ার ঘরে নাতির মুখ দেখবা। নাতি হইলে আমারে একখান দামি কাপড় দেওন লাগব কইয়া থুইলাম।

— দিমু দিমু। দোয়া কর তরা ভালাইতে সব হইয়া যাক।

কাজী সাহেব ভারী পকেটে হাসিমুখে বিদায় নিলেন।

মমতা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনল, ফুলমতী বাচ্চাটাকে আছড়ে ফেলে প্রবল আক্রোশে গাল দিচ্ছে — মর্! মর্! কুত্তার ছাও, একবারে মইরা যা। কিসের লিগা আল্লায় তরে দিছিল।

বাচ্চাটা প্রবল চিৎকারে কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ফুলমতীর আক্রোশের কণ্ঠ কান্নায় রুদ্ধ হলো — কিয়ের লিগা? কিয়ের লিগা বেশ্যার পেটে আইছিলি রে ক? ক অহন তরে লইয়া কী করুম।

ফুলমতীর আক্ষেপ শুনবার সময় কারো নেই। মমতারও নেই। মমতা দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠে জাহানআরার দরজায় এসে দাঁড়াল।

জাহানআরার ঘরের দরজা খোলাই ছিল। শরীরের কাপড় আলগা করে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়েছিল জাহানআরা। ময়না ওর পিঠ টিপে দিচ্ছে। জাহানআরার পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে ঘরটায় দৃষ্টি বুলিয়ে দেয়ালে বিদেশি নগ্নিকার ছবিতে তাকাল মমতা। ময়না ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল — কী লো মমতা? এহানে কী চাস?

মমতা সন্ত্রস্ত হলো — জানু বুর কাছে আইছি খালা।

জাহানআরা মুখ তুলল। চোখ দুটো তার টকটকে লাল। কাল রাতে তার সেই বিশ্রী মাথাব্যথাটা হয়েছিল। তিনটে সোনারিল ট্যাবলেটও জাহানআরার বন্য ভয়ংকর মাথাব্যথার উপশম ঘটিয়ে স্নায়ুগুলোকে নিস্তেজ করতে পারেনি। অস্থির জাহানআরা কাল বালিশ-তোশক ছিঁড়েছে। বোতল, থালা-বাসন আছড়ে ভেঙেছে। দেওয়ালে মাথা কুটে কপাল ফুলিয়েছে। সারা রাত ছটফট তছনছ করে ভোরে ঘুমিয়েছে। উঠেছে অনেক বেলায়।

জাহানআরা কষ্টে মাথা তুলে বলল —কী লো বিবি কী চাস?

বিবি সম্বোধনে খুশি হলো মমতা। বুঝল জাহানআরার শরীর খারাপ থাকলেও মেজাজ ভালো। মেজাজ ভালো থাকলে জাহানআরা ওকে ববিতা, কবরী, শাবানা বলে ঠাট্টা করে। এ ঠাট্টা অবশ্য এ বাড়িতে অনেকেই মমতাকে নিয়ে করে। করবার কারণও আছে। সিনেমার প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক মমতার। না খেয়ে সিনেমা দেখে ও। সিনেমার নায়িকাদের কায়দা-কানুনের অনুকরণ করে। সিনেমার কাগজ দেখে দর্জিবাড়ি গিয়ে পোশাক-পরিচ্ছদ বানায়। অবশ্য ওর এখন রোজগার ভালো। রোজ দশ-বারো জন লোক নিতে পারে মমতা। বখশিশও পায়। এ পাড়ায় অনেকেই জানে বরিশালের মমতা সিনেমার নায়িকা হবার জন্য বাড়ি থেকে পালিয়েছে। কিন্তু তারপর সিনেমার নায়িকা কেন, পর্দায় মুখটা পর্যন্ত দেখবার সুযোগ তার হয়নি। নানা ঘাটে-অঘাটে পড়ে এই নগরীর কালো পানির আবর্তে পাক খেতে খেতে এসে মুখ থুবড়ে পড়েছে এই অন্ধকার গলির জীবনে। এখনও ও সিনেমার জগতের স্বপ্ন দেখে। বখশিশের পয়সা দিয়ে সিনেমার পত্রিকা কেনে। তারকাদের স্টাইল, ফ্যাশন রপ্ত করতে চেষ্টা করে। ওর কাছে প্রত্যেকটা খরিদ্দার যেন তারকালোকের জগত থেকে নেমে আসে। সে স্বপ্ন প্রায়দিনই ভেঙেচুরে টুকরো হয়ে যায়। পাশবিক লালসা চরিতার্থ করতে যারা আসে, তাদের কারো মধ্যেই নায়কের ছাপ পাওয়া যায় না। তারা যেন ভিলেন হয়ে আসে। তবু ভাঙা ঘরে নোংরা বিছানায় শুয়ে সোনারিল ট্যাবলেট অথবা তাড়ির নেশার মধ্যে মমতা ওর কল্পনার লাল-নীল জগতে হারিয়ে যেতে থাকে। এই শ্রীহীন ভাঙা বাড়ি, নোংরা গলি, দুর্গন্ধময় ড্রেন, কুসিত ঝগড়া, মারামারি, অশ্লীল ঠাট্টার জগতটা অনেক দূরে সরে যায়। মমতা ভুলে যায় সিনেমা-জগতের অন্ধকার দিকটা, যে অন্ধকার তাকে এই জীবনে নিয়ে এসেছে।

জাহানআরা আধ-খোলা চোখে তাকিয়ে মমতাকে বলল — ডেরেস তো জব্বর একখান করছস।

মমতা হাসল। মমতার পরনে প্যান্ট আর লালরঙের শার্ট, বুকের উপর লেস বসিয়ে নকশা-তোলা। ভেতরে স্পঞ্জ দেওয়া ব্রেসিয়ার পরে শরীরের রেখাগুলোকে উগ্র আর প্রকট করে তুলেছে মমতা। জাহানআরাকে বলল না যে, সিনেমার নায়িকার অনুকরণে এই পোশাক দর্জিকে দিয়ে তৈরি করাতে তার অনেকদিন ধরে টাকা জমাতে হয়েছে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে বলল — জানু বু তোমার কেচিটা একটু দিবা? অহনি ফিরাইয়া দিমু।

ময়না চোখ তুলল — ক্যান লো কেচি দিয়া আবার কী করবি?

মমতা মুখের হাসি জিইয়ে রাখল — চুল কাটুম।

ময়না চোখ কপালে তুলল — চুল কাটবি কিয়ের লিগা রে? বৈরাগী হইবার শখ হইছে নাকি?

মমতা মাথার লম্বা চুলের গোছা হাতের মুঠোয় এনে হেসে ফেলল — তুমি দুনিয়ার খবর রাখ না খালা। আমি কি মুড়াইয়া চুল কাটুম নাকি? আইজকাল সিনেমায় দেখি সামনে থেইকা এমন কইর্যা চুল কাটে। মনে হয় ম্যামগো নাহাল খাটো চুল। আবার পিছনেও চুল থাকে।

ময়না জাহানআরার পিঠ টিপে দিতে দিতে মুখ বাঁকাল — গোলাপিপট্টির মাইয়া হইয়া ম্যাম হওনের শখ। কালে কালে কত নতুন খেইল দেখুম।

জাহানআরা ময়নাকে থামিয়ে দিল — থাম তুই। তুই এসবের বুঝবি কী লো! তগো নাগাল বেশ্যাগো দিন গ্যাছে। আমি তো বাইরে যাই, আমি এই সব জানি।

তারপর মমতার দিকে তাকিয়ে বলল — আয় মমতা, ঘরে আয়! ওই তাকের উপর কেচি আছে। লইয়া যা, আবার ঠিকমতো ফিরাইয়া দিবি। না দিলে কইলাম তরে আমি নাইড়া মাথা কইরা ছাড়ুম।

জাহানআরা হাসতে লাগল। মমতা স্বচ্ছন্দগতিতে এসে তাকের ওপর থেকে কাঁচিটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

পারুল কাপড় ধুচ্ছিল। মমতা পারুলকে ডাকল — ওই পারুলী! আয় জলদি। কেচি আনছি।

পারুল কাপড়টা নিংড়ে মেলে দিতে দিতে বলল — তুই বয়। আমি কাপড়খান মেইলা দিয়া আইতে আছি।

ঘরে বসে সিনেমা-ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠা খুলে মমতা একজন নামি নায়িকার চুলের স্টাইল পরখ করতে লাগল। পারুল একটু পরেই এলো। কমবয়সী মেয়েরা মমতাকে যেমন ঈর্ষা করে তেমন খাতিরও করে। মমতার মনটা ভালো। সাজগোজের জিনিস ও মাঝে মাঝে পারুলকে দেয়।

মমতা নিজেই আয়না ধরে সামনের কিছু চুল কেটেছিল। পারুল আসতেই তার হাতে কাঁচি ধরিয়ে দিয়ে বলল — পিছে দুই পাশের দুইগোছ চুল থাক কইরা কইরা কাটবি।

পারুলকে কাঁচি দিয়ে প্যান্টের হিপ পকেট থেকে সিগারেট দিয়াশলাই বের করে সিগারেট ধরাল মমতা। বলল — খাবি নাকি?

পারুল ছবির সঙ্গে মিলিয়ে চুল কাটায় মনোযোগ রেখে মাথা নাড়ল — অহন না। তর চুল কাইটা দিতাছি, চা খাওয়াবি তো আমারে?

মমতার এখন অনেকটা স্বাধীনতা ভোগ করবার অধিকার। পিরু-পারুলের মতো ও-ও ছিল হীরুর কেনা মেয়ে। স্বাধীন ব্যবসায় উঠবার পর ওর হাতে পয়সা থাকে। ঘরভাড়া দেয়। কাপড় বানায়। যখন-তখন চা-সিগারেট খায়। যে হারে ওর রোজগার বাড়ছে তাতে অল্প দিনেই ও একটা কেউকেটা হয়ে যেতে পারে।

মমতা মাঝে মাঝে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে পিরু-পারুল-কুসুমের কাছে গল্প করে — জানসনি কাইল একজন কাস্টমার আইছিল। এক্কেবারে রাজ্জাকের মতো চেহারা। কথাও মিডা মিডা। একটু ডরাইনা মানুষ। পড়ে কলেজে।

পিরু মমতার গল্পে উৎসাহ পায় না। পারুল মন দিয়ে শোনে।

সেই মুহূর্তে মমতাকে হিংসা করে। মমতা সারাদিন পাড়ায় নাচের ছন্দে লাফিয়ে বেড়ায়। ভাঙা রেলিঙে ঝুঁকে সিনেমার গান গায়।

পারুল চুলে কাঁচি চালাতে চালাতে বলল — জানসনি হেইদিন ইয়াসমীন বুর ঘরে একজন মানুষ আইয়া অনেকক্ষণ বইছিল।

মমতা চট করে বলল — ওইডা মাইয়ামানুষ নিকি! অর কাছে কে আহে আবার!

পারুল হেসে সায় দিল — ভাবখান তো য্যান কোহানকার বিবিসাব! শুনলাম বিবিসাব

বলে সবটিরে লইয়া মিটিং বহায়।

— হুঁ, রোজ তো খবরের কাগজ পড়ে।

— আইচ্ছা মমতা, তুইও তো বলে ভালো ঘর থিকা আইছস! তুই তো অমুন সিটকাইয়া থাকস না?

— আমি আর ওই ব্যাটার মতোন শক্ত মাগি। কস কী তুই পারুলী! ওর প্যাচাল আমার কাছে পাড়বি না। তুই দেইখা লইস সিনেমায় একবার আমি নামুমই। গল্প শুনছি আগেকার দিনের হিরোইনরা সব এই পাড়া থেইকাই আইত।

পারুল কাঁচি নামিয়ে রেখে বলল — দে, একটান সিগারেট দে। তুই আইজকাল এত সিগারেট খাস।

মমতা পারুলের হাতে সিগারেট দিয়ে মুচকি হাসল — সিগারেট কি আইজ খাওয়া শিখছি, বাড়ি থাকতেই খাইতাম। মা-বাবা জানত না। একটা ছ্যাড়া শিখাইছিল। বুঝলি আমাগো পাশের বাড়িতে কলেজপড়ুয়া একটা ছ্যাড়া থাকত। জানালা দিয়া হাঁ কইরা চাইয়া দেখত আমারে। একদিন একটু হাসছিলাম। আর কি, দিস্তা দিস্তা চিঠি দেওয়া শুরু করল।

পারুল উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করল — তরে ভালোবাসত? তুই বাসতি?

মমতা অভিজ্ঞ হাসি হাসল — ভালো কি আর একজনে বাসত! আমিও কি কমজনরে ভালোবাসছি! সিনেমা দেইখা নিত্যনিত্যি ভালোবাসায় পড়তাম। যার চেহারা সিনেমার হিরোর মতো দেখতাম তার লগেই ভালোবাসায় পড়তাম। শেষের জনই তো সিনেমায় চান্স দিব কইয়া ঘরের বাইর করল।

পারুলের সারাশরীর অচেনা ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলে উঠল। ওরা দু'জনেই একই পাড়ার একই ঘরের বাসিন্দা। অথচ পারুলের জীবনে এমন কোনো রোমাঞ্চকর ঘটনা নেই। হীরু ওকে কিনে এনে পাড়ায় বসিয়েছে। এখনও হীরুর লগ্নি মূলধনের লাভের টাকা উপচে ওঠেনি বলে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে সে প্রাণান্ত। রোজ দু'বেলা ভাতও জোটে না। তার চেয়ে আর কত বড় হবে মমতা! এখনি তার কত কদর। তাছাড়া মমতার অতীতটা কি কম চমকপ্রদ। কত পুরুষের প্রেমের উপচার গ্রহণের অভিজ্ঞতা আছে ওর জীবনে। পারুলের রাগ হলো। নিজের অক্ষমতার পুরো রাগটা গিয়ে পড়ল মমতার ওপর। পারুল এখনও জানে না ভালোবাসা কী। পারুল জানে না প্রেম কাকে বলে। স্ত্রী-পুরুষের যান্ত্রিক দেহ

বিনিময়ের অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কোনো বৈচিত্র্য জানা নেই পারুলের। মনে হলো মমতাই যেন স্বার্থপরের মতো সে অধিকার পারুলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। একা উপভোগ করছে। এ বাড়ির এত দুঃখ-কষ্ট-নির্মমতার মধ্যেও কেমন রঙিন প্রজাপতি হয়ে উঠছে। এই মুহূর্তে পারুল ভুলে গেল মমতার সঙ্গে ওর সখ্য আছে। হাতের কাঁচি যেন অক্ষম জ্বালায় প্রতিশোধের ইচ্ছায় বেপরোয়া হলো। এক ঝটকায় মাথা ছাড়িয়ে নিল মমতা। ততক্ষণে মমতার পুরো চুলের গোছা স্থানচ্যুত হয়ে পারুলের হাতে। রুখে উঠল ক্ষিপ্ত মমতা — ওই হারামি কুত্তি, এইয়া কী করছস?

পারুল স্তব্ধতা কাটিয়ে আমতা আমতা করল — কী জানি ক্যামনে কাইট্যা গেল। আমি বুঝবার পারি নাই।

পারুল সাবধানে চেপে গেল, মনের আপাত-আক্রোশে মমতার মেঘের মতো চুলের গোছা মুড়িয়ে কেটে দিয়েছে সে। কাটা চুলগুলো হাতে তুলে জ্বলন্ত চোখে পারুলের চালাকি-চাপা চোখ দেখল মমতা একমুহূর্ত। তারপরই পারুলের হাত থেকে কাঁচি ছিনিয়ে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। দু'জনের ধস্তাধস্তি, চিৎকার, মারামারি, গালাগালিতে কুসুম, পিরু অনেকেই ছুটে এলো। পিরুই প্রথমে আর্তচিৎকার করে উঠল — খুন! খুন হইয়া গেল।

মমতার হাতে ধরা কাঁচির ধারাল ফলা পারুলের গালের পাশে বিঁধে গেছে। গল গল করে লাল রক্ত বেরিয়ে এসেছে। রক্তে দু'জনেরই জামা-কাপড় মাখামাখি। জাহানআরা উঠে এলো। তার পেছনে কাঞ্চন আর ময়না। আরো অনেকে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। কাঞ্চনই দু'জনকে লাথি মেরে দুদিকে সরিয়ে দিল — ছিনাল মাগিরা নিজেরাই খুনাখুনি কইরা মরতে আছে।

জাহানআরা কাঁচিটা কেড়ে নিল মমতার হাত থেকে — ওই মাগি, এই কাম করনের লিগা আমার কেচি চাইয়া আনছিলি?

আঁকাবাঁকা রেখায় কাটা এলোমেলো খাটো চুলে ঝাঁকি মেরে মুখ ফেরাল মমতা — খুন কইরা ফালামু আইজ ওই খানকিরে। হিংসা কইরা ও আমার চুল কাটছে।

পারুলের দিকে আবার তেড়ে গেল মমতা। কাঞ্চন প্রচণ্ড চড় বসাল মমতার গালে — যা যা। আর ত্যাজ দেখাইস না। বেশি বাড়লে থানা পুলিশের হাতে পড়বি।

পারুল ভালোই জখম হয়েছে। রক্ত বন্ধ হচ্ছে না ওর। ময়না বলল — দেখছ কী করছে! কেচিটা গালে না বইয়া গলায় বইলেই হইছিল কাম!

কুসুম একটুকরো ছেঁড়া ন্যাকড়া এনে পারুলের গালের রক্ত চেপে ধরল। কাপড় ছিঁড়ে গালে পট্টি বেঁধে দিল। তবু রক্তে ভিজে উঠতে লাগল গালটা বারবার। পারুল কাঁদছে। ঝোঁকের বশে কাজটা করে ফেলেছিল। বোঝেনি মমতা এতটা হিংস্র হয়ে উঠবে।

খবর পেয়ে হীরু কোথা থেকে চলে এলো। হীরুকে দেখে সবাই সরে দাঁড়াল। হীরু এসে প্রথমেই এলোপাতাড়ি চড়-কিল-লাথি মারতে লাগল দু'জনকে। জাহানআরা ঘরের দিকে ফিরে যেতে যেতে বলল — অহন আর মাইরা কী হইব। বাইরের ডাকতরের কাছ থেইকা গালে সিলাই দিয়া আন। না হইলে রক্ত পইড়াই ছেড়ি মরব।

হীরু হুঙ্কার দিল — মরুক। মইরা যাউক। ঠ্যাং ধইরা ফালাইয়া দিয়া আহুম।

জটলাটা অনেকক্ষণ চলল। মমতা একসময় চোখ মুছতে মুছতে ছাদে উঠে গেল। পারুলকে নিয়ে কেউ ডাক্তারের কাছে গেল না। মান্নানের দোকান থেকে একটু জামবাক চেয়ে নিয়ে গালে চাপড়ে বসিয়ে শুয়ে পড়ল সে। একটু পরেই ঘটনাটা ভুলে গেল সবাই। ফুলমতী বগলে বাচ্চা ঝুলিয়ে এসেছিল। যাবার সময় জাহানআরার ঘরের সামনে কী মনে করে দাঁড়িয়ে পড়ল। দরোজার পাশ থেকে উঁকি দিয়ে বলল — জাহানআরা বু একটা কথা শুনবা?

বিরক্ত হয়ে বিছানায় উঠে বসল জাহানআরা — নাঃ শালার শান্তিমতো একটু শুইবারও উপায় নাই। এই একজন কেচি লইয়া খুনখারাবি বাধাইল। তুই মাগি কী চাস আবার?

ফুলমতী সংকোচে, ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল। শুকনো মুখে বলল — আমারে বিশটা টাকা কর্জ দিবা?

জাহানআরা চোখ বড় করে ফুলমতীর আপাদমস্তকে বুলাল। বলল — বি...শ ট্যাকা?

— হ, বড় ঠ্যাকা।

ফুলমতী মাটি থেকে দৃষ্টি তুলে অনুনয় ফোটাল কণ্ঠে।

জাহানআরা শক্ত হলো — ট্যাকা আমি হাওলাত দেই না যে তা না, দেই। তয় তরে ট্যাকা দিমু কিসের ভরসায়? আইজ তো খবর পাইলাম কাজী তরে ঘর ছাড়বার কইছে।

ফুলমতী অনুনয়ে গলে গেল — দেও বু, দেও। আল্লায় তোমার কামাই আরো বাড়াইব।

নাইলে বাচ্চাডা আমার না খাইয়া মইরা যাইব। আইজ কয়ডা দিন ধইরা নিজে একটানা উপাস আছি। বুকে দুধ নাই। বাচ্চাডা দাপাইয়া মরতে আছে।

জাহানআরা কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে ওর বুকে আঁকড়ে ধরা বাচ্চাটা দেখল। তারপর উঠে দুটো দশ টাকার নোট বের করে দিল ফুলমতীর হাতে — নে। বাচ্চার দুধ কিনা আন। আর ট্যাকাটা ঠিকমতো ফিরত দিস।

টাকা হাতে নিয়ে কৃতজ্ঞতায় তরল হয়ে গেল ফুলমতী — দিমু বুজি। দিমু। চাইরডা মানুষ বহাইবার পারলেই তোমার ট্যাকা দিয়া যামু।

জাহানআরা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। মাথাটা আবার টনটন করছে। এই মাথাব্যথাটা শুরু হলেই জাহানআরা পাগল হয়ে যায় প্রায়। নিজের দামি শরীর, আয়েশি ঘর, টাকার সচ্ছলতা সবই তুচ্ছ হয়ে যায়। সবকিছুর ওপর তখন বিতৃষ্ণা হয়। তার বাঁধা সম্ভ্রমের খরিদ্দারেরা, যারা তোয়াজে-খাতিরে জাহানআরাকে মাথায় তুলে রাখে তাদের সে তখন ঘৃণা করে। ইদানীং মাথাব্যথাটা ঘন ঘন হচ্ছে। সেই যে পোড়াকপালে লোকটা এসে কী সব অদ্ভুত কথা বলে গিয়েছিল, তারপর থেকেই জাহানআরার কী যেন হয়েছে। লোকটার চোখের ভাষা এখনও মনে করতে পারে জাহানআরা। লোকটা বুঝি বলতে চেয়েছিল — 'সুন্দরী জাহানআরা! তুমি কারো স্ত্রী নও, মা নও, বোন নও। যতদিন তোমার শরীরটার আকর্ষণীয় শক্তি থাকবে ততদিন তুমি আছ। তারপর একদিন তুমি গোলাপজান বুড়ির মতো ড্রেনের পাশে পঙ্গু, অথর্ব হয়ে পড়ে থাকবে। নয়তো রহিমনের মতো ব্যামোতে পাগল হয়ে ঘুরবে।'

জাহানআরা চিন্তা ঝেড়ে ফেলে মনকে ধমক দিল। এ ব্যবসায় সে তো একদিনে এত ওপরে ওঠেনি। কত কিছুই তো সে দেখেছে। ওই লোকটার ভুতুড়ে অস্তিত্বকে সে এত পাত্তা দিচ্ছে কেন? তার গুণগ্রাহীরা যে-সে ব্যক্তি নয়। দেশে-দশে ক্ষমতার লোক সব। তাছাড়া এর মধ্যে জাহানআরা দুটো মদের দোকান দিয়েছে পাড়ায়। আর কিছু না হোক, সে একজন শাঁসাল বাড়িওয়ালি হয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে শেষ বয়সটা কাটাতে পারবে। কী যেন তবু মাঝে মাঝে কী একটা সন্দেহ, কেমন একটা ভয় পেয়ে বসে তাকে। জাহানআরার মনে আছে, আগে সে যে পাড়ায় থাকত সে পাড়ায় থাকত মঞ্জুরী বলে এক দাপটওয়ালা মেয়েলোক। পটু বেশ্যা বলে তার খুব নামডাক ছড়িয়েছিল। পাড়ার সবাই

খাতির করত তাকে। বাইরের 'কলে' যেত ঘন ঘন। বড় বড় পার্টির ডাক আসত। মদের দোকান দিয়েছিল। ঘরভাড়া নিয়ে মেয়ে খাটাত। টাকাকড়িও করেছিল বিস্তর। সেই মঞ্জুরীকে তার তাঁবেদার গুণ্ডাই একদিন খুন করে ফেলল। তারপর মঞ্জুরীর সব সম্পত্তির মালিক হয়ে বসল। কী যেন এমন যদি কিছু ঘটে যায় জাহানআরার ভাগ্যে! এ পাড়ায় তো বিশ্বাস বলে কোনো বস্তু নেই। এমন যে বিশ্বাসভাজন কাঞ্চন, তার ওপরও মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। বুঝতে পারে কাঞ্চনের নজর আছে তার মদের দোকানের ওপর। দোকানটা লাইসেন্স ছাড়া। সেই জন্যই তো হয়েছে বিপদ। দেবে নাকি একদিন অন্য গুণ্ডা দিয়ে কাঞ্চনটাকে ফাঁসিয়ে! তাতেই বা সমাধান কোথায়? আরো দশজন কাঞ্চন হয়তো গজিয়ে উঠবে। তারা হয়তো কাঞ্চনের চেয়েও অবিশ্বস্ত হবে।

জাহানআরা ছটফট করে উঠল। এসব চিন্তা মনে এলে তার একটা আশ্রয় খুঁজতে ইচ্ছে করে। একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে হয়। কোন আশ্রয় আঁকড়ে ধরবে জাহানআরা? সাহায্য ভিক্ষা করবে কি সেইসব ধনী নারীবিলাসী শক্তিমানদের কাছে? কিন্তু তাদের মান-সম্মান আছে, ঘর আছে, স্ত্রী-পুত্র আছে। তারা কি তেমন আশ্রয়ের হাত বাড়াবে? অস্থির জাহানআরা দরজা খুলে বাইরে এলো। চেঁচিয়ে ডেকে বলল — ও ময়না, দোকান থিকা একটা বোতল দিয়া যা আমারে।

একটু পরেই বোতল হাতে ময়না এলো। বলল — কাইল রাইতটা এত কষ্ট পাইলা, অহন নাইয়া-ধুইয়া খাইবা-দাইবা। তা না আবার বোতল ক্যান?

জাহানআরা বোতল খুলে গ্লাসে ঢেলে বলল — চুপ কইরা বইয়া থাক মাগি। আমার যা খুশি তাই করুম।

ময়না অপ্রসন্ন মুখে দরজার কাছে বসে রইল। গ্লাস খালি করে আবার ঢালল জাহানআরা। বলল — খাবি নি একটু?

ময়না জানে জাহানআরার এ প্রশ্নের অর্থ তাকে খেতে হবে। খুশিই হলো। বিলাতি কিনবার পয়সা তার নেই। জাহানআরার দৌলতেই এসব একটু-আধটু পেটে পড়ে। গ্লাস নামিয়ে নিয়ে এলো সে। জাহানআরাই ঢেলে দিল। ময়না খেতে খেতে দেখল জাহানআরার চোখের রং বদলাচ্ছে। ময়না জানে জাহানআরা একবারে বেশি খেতে পারে না। অল্পেই নেশা ধরে যায়।

জাহানআরা ডাকল — ময়না!

দু'চার ঢোক খেয়ে ময়নাও ভালো বোধ করছে। হাল্কা গলায় বলল — কী কও গো বু?

জাহানআরা ধমক দিল — ওই শালার মাগি, খালি বু বু করস ক্যান? আমার নাম যে জানি বেশ্যা তা জানস না?

ময়না জবাব দিল না।

জাহানআরা আবার ধমক দিল — চুপ মাইরা রইলি ক্যান? ক দেহি সেদিন যে শালার পুত আইছিল, আমার বিছানে না শুইয়াই পঞ্চাশটা ট্যাকা ফালাইয়া গেল, হেই হারামি গেল কই?

ময়না গ্লাস নামিয়ে বলল — হে ব্যাটা তো আহে। ইয়াসমীনের ঘরে ঘণ্টা কাবার কইরা যায়।

জাহানআরা চটে উঠল। লাল চোখে বলল — ইয়াসমীনের ঘরে? ক্যান শালার পুত কি জাহানআরারে দেইখা ডরাইয়া গ্যাছে? বুঝলি ময়না, ওইডা একটা মাইগ্গা কমজোর মরদ। আবার আইলে খবর দিবি। অরে আমি সারা জনমের মতো গলিতে শোয়াইয়া রাখুম।

ময়না বুঝল জাহানআরার নেশা চড়েছে। কথা বলল না সে। আধ-খাওয়া বোতলটা হাত দিয়ে সরিয়ে রেখে জাহানআরা হঠাৎ এসে দু'হাতে ময়নাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল — ময়না রে! আমারে কেউ না কেউ একদিন মাইরা ফালাইব। খুন কইরা ফালাইব। ময়না ক তুই আমারে হামলাইয়া থুবি? ক তুই ক?

ময়না জাহানআরার বেসামাল শরীরটা এনে বিছানায় শুইয়ে দিল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। জাহানআরা ময়নার হাত দুটো প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরে টেনে টেনে বলতে লাগল — ময়নারে তুই আমারে ছাইড়া যাইস না ময়না। ময়না তুই ক, কী হইব আমার? কী হইব?

ময়নার বুক কেঁপে উঠল। এ প্রশ্নের উত্তর ময়নার জানা নেই। বোধ হয় এ বাড়ির কারোই জানা নেই। জানা নেই কার আছে কী অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। জাহানআরার নেশাসক্ত বিলাপ হাজার প্রশ্নের আঘাতে গিয়ে আছড়ে পড়তে লাগল জরাজীর্ণ বাড়ির নীরব দেওয়ালে।

॥ ৬ ॥

কদিন থেকে একটানা বৃষ্টি হচ্ছে। কখনও জোরে। কখনও আস্তে। সারাটা গলি কাদা-পানিতে থই থই করছে। ড্রেন উপচে উঠেছে নোংরা বৃষ্টির পানিতে। ঢুকে পড়েছে কারো কারো ঘরে।

সন্ধ্যার আগে বৃষ্টি আরো চেপে এলো। গুমগুম শব্দে আকাশ ডাকছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। জরিনাদের ঘরে এসে উঠেছে শান্তি। ওর ঘরে বৃষ্টিতে দাঁড়াবার উপায় নেই। শান্তি হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে ঘরের জিনিসপত্র টেনে তুলছিল চৌকির ওপর। এখানেও সারা ঘরে গোড়ালি ডুবানো পানি ঢেউ খেলছে। জরিনা একটা ছেঁড়া ময়লা প্লাস্টিকশিট দিয়ে চৌকির একধারে ময়লা ছেঁড়া কাঁথা, বালিশগুলো ঢাকা দিতে দিতে চেঁচিয়ে বলল — ওই কুসমি, কই গেলি? একটা পিছা লইয়া পানিডা ঘরের থন সাপটাইয়া বাইর কর।

শান্তি বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে কুৎসিত গালি ছুড়ে বলল — কুসুম তো দোকানে গ্যাছে।

ছাদ দিয়ে ঝরঝর করে পানি পড়ছে। ছাদের পানির নিচে বাঁকাটেরা গামলা আর বালতি পেতে দিয়ে শান্তি বলল — জরি, আমার ঘরে তো খাড়ান যায় না। তগো ঘরেই আইজ থাকন লাগব। এই ম্যাঘে মানুষ আইলে বহামু কেমনে?

শান্তির কোমর পর্যন্ত শাড়ি ভিজে গেছে। জরিনাও ভিজেছে। চৌকির ওপর ডাঁই করে তোলা থালা, হাঁড়ি, বাসন, চুলো, মসলার কৌটা অন্যান্য টুকিটাকির দিকে একবার তাকিয়ে জরিনা বলল — এই ম্যাঘে কি আর মানুষ আইব?

ভিজতে ভিজতে কুসুম এলো। আঁচলের তলা থেকে ঠোঙা বের করে শান্তির হাতে দিয়ে বলল — দোকানথনে আনতে আনতে ভিজা গেল। এই নেও তোমার মুড়ি।

শান্তি মুড়ির ঠোঙাটা হাতে নিয়ে দেখল মুড়িগুলো ভিজে মিইয়ে গেছে। ঝাঁঝিয়ে উঠে কুসুমকে বলল — মাসির ছাতিডা চাইয়া নিলি না ক্যান? মুড়িগুলিরে চুপসাইয়া আনলি।

কুসুম বৃষ্টিতে ভিজে একাকার। ভেজা চুল বেয়ে টপ টপ করে পানি ঝরছে। ঠোঁটটা কালচে দেখাচ্ছে। ভেজা শাড়িটা নিংড়ে পানি ঝরাতে ঝরাতে কুসুম বলল — মাসি তো ছাতি দেয় না। কী করুম?

জরিনা মুখ বাঁকাল — কঞ্জুস বুড়ির ছাতিখান য্যান আমরা খাইয়া ফালামু।

কুসুমের শীত করছে। কুণ্ঠিতভাবে বলল — শান্তি বুজি আমারে একখান শুকনা কাপড় দিবা? জবর শীত করতাছে।

শান্তি ঝামটা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল — ছেড়ি দ্যাখ যাইয়া আমার ঘরে। পানির বইন্যা ছুটছে। আমার বলে সব ভিজাপুইড়া নাশ, তরে আমি শুকনা কাপড় দিমু কইথনে?

কুসুমের ঠাণ্ডায় কালিয়ে যাওয়া মুখ দেখে জরিনা নরম হলো — মুরগির ছাওর নাহাল কাঁপতে আছস দেহি। আমার বাক্সে একটা পুরান কাপড় আছে, দেই বাইর কইরা। তার আগে তুই পিছাড়া লইয়া ঘরের পানি সাপটাইয়া বাইর কর।

শুকনো কাপড়ের আশ্বাসে কুসুম উৎফুল্ল হলো। ঘরের কোনা থেকে ঝাঁটা তুলে নিয়ে পানি ঠেলে বের করতে বসল উৎসাহে।

শান্তি টুকরি খুঁজে দুটো পেঁয়াজ তুলে কেটে মুড়ি মাখল। শান্তির আজ বৃষ্টির জন্য দুপুরে চুলো জ্বলেনি। মেজাজটা খারাপ লাগছে। এ ঘরটায় দু'রাত থাকলে এ ঘরেরও ভাড়া দিতে হবে। যত যন্ত্রণা তো এই বর্ষার দিনে। শান্তি ও ঘরটা নিয়ে ভুলই করেছে।

মাখা মুড়ি নিয়ে শান্তি ডাকল — আয় লো জরিনা, কুসুম খাইয়া নে। জরিনাও চুলো জ্বালাতে পারেনি। চুলোর ভেতর পানি পড়ে ভিজে থক থক করছে। এ পাড়ায় আজ সবারই প্রায় এক অবস্থা। সবার ঘরের ছাদ দিয়েই পানি পড়ে। ড্রেনের পানি গলি উপচে ঢুকে পড়েছে অনেকের ঘরে। এর মধ্যে চুলো জ্বালানো, রান্না-বান্না অনেকের পক্ষেই অসম্ভব। কেউ হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে খায় এসব দিনে। কেউ চা-মুড়ি খেয়ে পেট ভরায়। অনেকে না খেয়ে থাকে। ঘরের পানি অনেক কষ্টে ঝাড়ু দিয়ে বের করে তক্তা আর থান ইট দিয়ে পানি আসবার রাস্তাটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায় কুসুম। বৃষ্টির পানিতে ভিজে ওর শরীরে কাঁপ উঠেছে। জরিনা একটা পুরোনো ছেঁড়া শাড়ি ছুঁড়ে দিল — নে। মাথাটা মুইছা কাপড় বদলাইয়া ফালা।

কুসুম ওদের সামনেই নিরাবরণ হয়ে ভেজা কাপড়ে শরীর মুছে শুকনো শাড়িটা জড়িয়ে নিল।

জরিনা একথাবা মুড়ি মুখে তুলে বলল — ছেড়িটার গতরে কিছু নাই। থাকব কই থিকা? প্যাটে ভাত পড়লে তো!

পা দিয়ে মেঝে মুছে চিটচিটে পিছল কাদা কিছুটা লেপে দিয়ে কুসুম শান্তির পাশে বসল। শান্তি মুড়ি তুলে দিল ওর আঁচলে। কুসুম কৃতার্থ হয়ে গেল। মুড়ির পয়সা দিয়েছে শান্তি আর জরিনা। কুসুমের এতে ভাগ পাবার কথা নয়। মুড়ি খেতে খেতে কুসুম বলল —

গোলাপজান বুড়িটা আইজ মরব।

জরিনা ঠোঁট উল্টাল — হঃ এত সহজেই বুড়ি মরছে। এহানে-ওহানে পইড়া থাকে। দুইটা পাও পইড়া গ্যাছে। হাপুড় কাইটা চলে। খাওন জোটে না। তাও তো বুড়ি বাঁইচ্যা রইছে।

কুসুম বলল — না গো বু, এত ম্যাঘের মইধ্যে মান্নানের দোকানের ধারে পইড়্যা ভিজতে আছে। এইবার আর বাঁচব না।

শান্তি একটু উদাস হলো — ভাইবা দ্যাখ দেহি, ওই গোলাপজান বুড়িও তো এককালে আমাগো মতো আছিল। অহন বয়স হইছে। চক্ষে দ্যাহে না। হাঁটবার পারে না। একদিন ডেরেনের ধারে মইরা থাকব। ডোমে নিয়া ফালাইয়া দিয়া আইব।

শান্তির কথায় সবাই চুপ করে রইল। তিনজনেই অন্যমনস্ক হলো। এই আঁধার-করা বৃষ্টির মধ্যে নিজেদের অবশ্যম্ভাবী একটা পরিণতির ছায়া পলকের জন্য উদাস করে তুলল তিনজনকেই। কুসুমের মনটা ভারি খারাপ হলে গেল। একটু আগে সে দেখে এসেছে সত্তর বছরের বুড়ি গোলাপজান মান্নানের দোকানের চালার ছায়ায় আধঢাকা হয়ে ভিজে-গুটিয়ে ছোট হয়ে পড়ে আছে। কে যেন ছাতা মাথায় দিয়ে যাবার সময় পা দিয়ে লাথি মেরে সরিয়ে গালি দিয়ে উঠেছিল — আরে এই বিলাইর হাডিড মাগি মরেও না।

কুসুম দেখেছিল বৃষ্টির ঝাপটায় পানি ঢুকছে বুড়ির হাঁ-করা মুখের ভেতরে। একেকবার কম্পিত হাত তুলে বুড়ি বৃষ্টির ধারালো ফলা থেকে মুখ আড়াল করার চেষ্টা করছে।

কুসুম কাদামাখা পা দুটো ঘষতে ঘষতে বলল—আইচ্ছা জরি বু! এই ম্যাঘের রাইতটা বুড়িরে আমাগে ঘরের খাটালে শুইবার দিলে হয় না?

জরিনা ভেংচি কাট্□ল — ইঃ দরদের হাতেম তাঈ। ওই যে কী না কয় — 'নিজে থাকনের নাই ঠাঁই, বিবির লগে আঠারজন দাই।'

আ-লো! ঘর কি আমাগো বাপের সম্পত্তি যে আমরা যারে ইচ্ছা বিনা পয়সায় থাকবার দিলাম!

মুড়ি খাওয়া শেষ করে শান্তি বলল — নে। আকামের প্যাঁচাল ফালাইয়া থো। ওই কুসমি! জিনিসপত্র সব এক কিনারে ঠেলা দিয়া নাগর গো শোওনের জায়গা কর।

কুসুম উঠল। চৌকির ওপর জিনিসপত্র সরাতে সরাতে বলল — আইজ কি মানুষ আর

আইব? এই ম্যাঘে শিয়াল-কুত্তাও বাইরায় না।

বাইরে বৃষ্টির ঝালর দেওয়া চাদর পরে সন্ধ্যা নেমেছে। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে কোথা থেকে কেঁপে কেঁপে ভেসে আসছে আজানের শব্দ।

যথারীতি ঘরে একগোছা আগরবাতি জ্বালিয়ে জরিনা সাজগোজ করতে বসল। মেজাজটা খারাপ হয়ে আছে। এই বর্ষা শুধু যে কষ্টই আনে তা নয়, ব্যবসারও এটা মন্দ সময়। খরিদ্দার কম আসে। তবু দু-পাঁচজন আসে। এবং অনেকের বাঁধা খরিদ্দার ঝড়-বাদলা মাথায় করেও তার পছন্দের মেয়েমানুষের কাছে হাজিরা দেয়।

প্রবল বর্ষণেও আলো জ্বলে ওঠে ঘরে ঘরে। ময়লা পানির দুর্গন্ধ ছাপিয়ে আগরবাতি সুবাস ছড়ায়। ছেরুর মদের দোকান খোলে। দু'চারজন খরিদ্দার এসে ভিড় জমায়। বর্ষার সন্ধ্যায় দেশি মদ খাওয়া লোকগুলোকে উদ্দীপ্ত করবার জন্য হিজড়া নাবু তার নকল সাজগোজের শরীর দুলিয়ে নাচ শুরু করে। ফাটা গলায় গান ধরে —

নতুন গাছে ফুল ফুট্যাছে
ডাল ডাইংগ না রে মালী
ফুল ছিঁড়ো না।

ছেরুর দোকানের আলোর বৃত্তটাকে ঘিরে বাদলা-পোকা ভিড় জমায়। আর স্যাঁতসেঁতে ভেজা, পানি-জমা কর্দমাক্ত গলিতে দু-একজন করে লোক ঢুকে পড়ে। মেয়ে পছন্দ করে। দরাদরি করে ঘরে ঢুকে পড়ে। এই বৃষ্টিতেও শান্তির একজন খরিদ্দার আসে। জরিনা আর কুসুমকে বেরিয়ে আসতে হয় বাইরে। বৃষ্টির ছাটে ভিজতে ভিজতে সিগারেট টানে জরিনা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে গলির মুখের দিকে। নতুন মানুষ আসে কিনা সেই আশায়। কুসুমের শরীরটা খারাপ লাগতে থাকে। বুকে-পিঠে কেমন চাপধরা ব্যথা। মাথাটাও ঝিমঝিম করছে। কয়েকবার কাশল কুসুম। খারাপ মেজাজে ধমক দিল জরিনা — খ্যাকর খ্যাকর লাগাইলি কেন?

কুসুম ক্লান্তকণ্ঠে উত্তর দিল — গতরডা ভালো লাগে না, দেহ তো বুজি আমার জ্বর আইছে নাকি?

জরিনা ওর কপালে, বুকে হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করে বলল — হাচাই তো। শরীল যে খুব গরম। আইজ আর মানুষ বহাইস না।

কুসুম ম্লানমুখে উত্তর দিল — এই গাদলায় মানুষ পামু কই থনে?

বৃষ্টি আরো ঝাঁপিয়ে নামে। চতুর্দিকে পানির ছড়ছড়, কলকল শব্দে কুসুমের মনে হয় গোলাপজান বুড়ির মতো সেও যেন বৃষ্টিতে তলিয়ে যাচ্ছে। একটু শুকনো ঘর আর শুকনো বিছানার জন্য প্রাণটা আকুলি-বিকুলি করছে। কুসুমের চোখের সামনে গুঁড়ো গুঁড়ো অন্ধকার ঝরতে থাকে। তীব্র শীতের অনুভূতি নিয়ে বৃষ্টির ছাটে ভিজতে থাকে কুসুম।

পিরু শুয়ে তখন স্বপ্ন দেখছিল তাদের গ্রামের খালের পানিতে হালিমনের সঙ্গে গামছা ছেঁকে কুঁচো চিংড়ি ধরছে।

পারুলের স্বপ্নে তখন পরীর পাখার গতিভঙ্গ। জাহানআরার মতো বড় গাড়ি চড়ে বড়দরের অভিসারে চলেছে যেন সে।

মমতা ওর পাশে শুয়ে আরেক সুখের স্বপ্নে ভেসে গেছে। হলের রূপালি পর্দা জুড়ে ভেসে উঠেছে মমতার মুখ। পর্দায় মমতা প্রেমের গান গাইছে। দর্শকরা মুগ্ধ-বিমোহিত।

তখনি ভূমিকম্পের মতো সারাবাড়ি কাঁপিয়ে কী যেন প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে পড়ল। ধড়মড় করে ঘুমের চোখে উঠে বসল জাহানআরা। উঠে পড়ল শান্তি, বকুল, মর্জিনা, কুসুম, জরিনা, ইয়াসমীন, মতি। উঠে পড়ল অন্ধকারে বাড়ির সবাই। বাইরে প্রবল বর্ষণ। ঘুটঘুটে অন্ধকারে কারো চেহারা কেউ দেখতে পেল না। বাতাসের ঝাপটায় কোথায় যেন কার ঘরের দরজা আছড়াচ্ছে। টিনের চালার ঢনঢন শব্দ হচ্ছে। ঘুম-ভাঙা চোখে জরিনার প্রথম যে অনুভূতিটা হলো সেটা ভয়ের। প্রচণ্ড ভয়ের। মনে পড়ল এমনি এক রাতে সমুদ্রের গরকি এসেছিল প্রচণ্ড শব্দ আর প্রবল ঘূর্ণি নিয়ে। খেপুপাড়ার মেয়ে জরিনার সব ভেসে গিয়েছিল সেই সত্তর সনে। রিলিফের নামে নিঃস্ব-উদ্ভ্রান্ত অভুক্ত জরিনাকে দালালরা ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল এই শহরে।

মতির মনে পড়ল, আজ থেকে কত বছর আগের সেই হিন্দু-মুসলমানের রায়টের কথা। মনে পড়ল সেই অন্ধকার রাতটা, যখন সারা বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গুণ্ডারা তাদের দরজায় প্রচণ্ড শব্দে আঘাত করেছিল। এমনি ভয়াবহ কম্পন তুলে দরজা ভেঙে পড়েছিল। চোখের সামনে মা-বাবা, ঠাকুরমা, ছোট ভাই দুটোর ছুরিকাঘাতে মৃত্যু দেখেছিল মতি। ইজ্জত হারানো মতিকে এসে পড়তে হয়েছিল এই পাড়ায় ভাগ্যের লিখন মেনে।

বকুলের মনে পড়ল, একাত্তরে যুদ্ধের সময় মোহাম্মদপুরের বিহারি গুণ্ডারা ধরে

এনেছিল তাকে। এমনিভাবে মনের ভিত ভয়ের কাঁপনে কেঁপে উঠেছিল সেদিন।

অন্ধকার বাড়ির মধ্যে আঁধারে ভেসে বেড়ানো কণ্ঠের ডাকাডাকি চিৎকারের মধ্যে জরিনাকে দু'হাতে জড়িয়ে কুসুম ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। একটা ভয়াবহ রাত তার অবচেতন থেকে বিরাটকায় মাকড়সার মতো অনেকগুলো পা ফেলে বেরিয়ে এলো যেন। সেই চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষে ভাতের অভাবে পাগল হয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছিল সে মা-বাবার সঙ্গে। শহরে ভিক্ষুক হয়ে গিয়েছিল তারা। পুরোনো শহরে একটা পোড়ো বিল্ডিং ছিল তাদের রাতের আবাস। অনেকগুলো দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামের মানুষ ভিক্ষুক হয়ে মাথা গুঁজেছিল সেখানে। কুড়িয়ে চেয়েচিন্তে আনা খাবারে কোনোরকমে পেটের ক্ষুধাকে শান্ত করে অনেকগুলো পরিবার যখন একাকার হয়ে দলা পাকানো কুকুরের মতো জড়াজড়ি করে ঘুমোচ্ছিল, তখন দুটো ট্রাক এসে থেমেছিল বড় রাস্তায়। চিৎকার, কান্নাকাটি, আর্তনাদে রাতের আঁধার কেঁপে উঠেছিল। তাতে আলোজ্বলা শহরের সুরম্য অট্টালিকাগুলোর ঘুম ভাঙেনি। ঘুম ভাঙেনি জেগে থাকা থানার প্রহরীদের। বেওয়ারিশ অভাবী ক্ষুধার্ত কিশোরী আর সোমত্ত মেয়েগুলোকে ট্রাকে তুলে নিয়েছিল সশস্ত্র গুণ্ডারা। একজন কুসুমের মুখ চেপে ধরে শাসিয়েছিল — খবরদার। চিল্লাবি না। চিল্লাইলে গুষ্টিসুদ্ধা খুন হইয়া যাবি।

কুসুম আজো জানে না কেন এতগুলো লোকের আর্তচিৎকারে শহরের বুকে এতটুকু আঁচড় পড়েনি। জানে না কাদের কুচক্রী-হাত ট্রাক ভাড়া করে গুণ্ডা দিয়ে মা-বাবার বুক থেকে তাদের ছিনিয়ে এনেছিল! জরিনাকে আঁকড়ে ধরে কুসুম কাঁপতে থাকল।

অন্ধকার ঘরে মৃগীরোগীর মতো ঝাঁকুনি দিয়ে সারা শরীরে কম্প উঠল ইয়াসমীনের। শব্দ হলো কোথায়? সারা পৃথিবীটা কি আবার ভিতসুদ্ধ কেঁপে উঠল? ইয়াসমীনের চোখের অন্ধকার পর্দায় আরেক নেকড়ে অরণ্যের ছায়া দুলে উঠল। অন্ধকার ঘরে মাকে আঁকড়ে ধরে ইয়াসমীন ভীষণ কাঁপছে। তাদের পুরো পাড়াটা এক কনভয় মিলিটারি ঘিরে ফেলেছে। বাবা বলছে — সেই ছেলেটা, সেই কামাল কোথায়?

মা ফিসফিস করে বলল — সে আগেই রান্নাঘরের পেছনের পাঁচিল টপকে বেরিয়ে গেছে।

বাইরে দরজায় জোড়া-জোড়া বুটের লাথি পড়ছে। অনেকগুলো কণ্ঠ হুঙ্কার দিচ্ছে —

দরওয়াজা খোল। খোল দোও কঞ্জর কে বাচ্চে!

বাবা এগিয়ে গেলেন — দরজাটা খুলে দিই!

মা আর্তচিৎকার করে উঠল — না, না, খুলো না দরজা।

অন্ধকারে বাবা এগিয়ে গেলেন — না খুললে ওরা ভেঙে ঢুকবে। আর কামাল নিশ্চয়ই এতক্ষণ নিরাপদ দূরত্বে চলে গেছে।

বাবা দরজা খুলে দিয়েছিলেন। আর ঘরের মধ্যে আছড়ে পড়েছিল যেন এক নিষ্ঠুর হিংস্র কালবৈশাখী।

বাবা বেয়নেটের আঘাতে দরজার সামনেই মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সৈনিকটিকে আশ্রয় দেবার অপরাধের শাস্তি থেকে বাড়ির কেউ রেহাই পায়নি। বাবা-মা, ভাই-বোন অনেকগুলো রক্ত বয়ে যাওয়া মৃতদেহের ওপর দিয়ে ইয়াসমীনকে হিঁচড়ে এনে জিপে তোলা হয়েছিল। আর তোলা হয়েছিল চাকর আলীকে। জিপে উঠে ইয়াসমীন জেনেছিল আলীই হানাদার সেনাদেরকে কামালের খবর দিয়ে এসেছিল।

প্রচণ্ড শারীরিক অত্যাচারের পর মেজরের সামনে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল বিধ্বস্ত ইয়াসমীনকে। বিবৃতি দিতে হয়েছিল কামাল সম্পর্কে। কামাল ওর ভাইয়ের বন্ধু ছিল। ভাই পঁচিশে মার্চ রাতে 'হলে' মারা গেছে। কামাল মুক্তিবাহিনীতে চলে গেছে, তা ওরা জানে। ঢাকায় একটা অপারেশনে এসে ওদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ জমা রেখেছিল। সেগুলো সরিয়ে নিয়ে গেছে। কামাল কোথা থেকে এসেছিল, কোথায় গেছে, দলে আর কারা আছে কিছুই ইয়াসমীন জানে না। মেজর বিশ্বাস করেনি। ক্রমাগত চলেছে নানা প্রক্রিয়ায় শাস্তি। শেষ পর্যন্ত ইয়াসমীন চালান হয়েছিল আরো অনেক ধরে-আনা মেয়ের দলে। নিরস্ত্র মানুষের সঙ্গে যুদ্ধের দম্ভ দেখিয়েছিল সৈনিকের পোশাকপরা যে ভিন্নভাষী মানুষ নামক জন্তুগুলো, তাদের লালসা চরিতার্থে হেরেমে দীর্ঘ ছয় মাস বন্দিজীবন কেটেছিল ইয়াসমীনের। তারপর সূর্য উঠেছিল। তারপর স্বাধীন বাতাস আর জয়ের ধ্বনি নিয়ে শীতের সন্ধ্যা সমাহিত হয়েছিল। ইয়াসমীন মুক্তি পেয়েছিল। মানসিক ভারসাম্য তখন তার প্রায় লোপ পাওয়ার পথে। সুস্থদৃষ্টি মেলে ইয়াসমীন যখন তাকাল তখন সে একটি আশ্রয়কেন্দ্রে। সেখানে নির্যাতিতা নারীদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। মায়ের বুকে যোদ্ধাসন্তান ফিরে এলো। মানুষের জীবনযাত্রার চাকা আবার স্বাভাবিক গতিতে ঘুরল। খবরের কাগজে

নাম গোপন করে অনেক মর্মস্পর্শী রিপোর্ট ছাপা হয়েছে তাদের সম্পর্কে। লোকে সাগ্রহে পড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভেবেছে — 'খুব বেঁচে গেছি, আমার স্ত্রী-কন্যা-বোনের এই দশা হয়নি।'

তারপর সরকার সাড়ম্বরে তাদের 'বীরাঙ্গনা'র আসনে বসাল। বীরাঙ্গনাদের বিয়ে করে সুস্থজীবনে ফিরিয়ে আনবার জন্য উৎসাহ দেওয়া হলো যুবককুলকে। লোকে কাগজে পড়ল, সংস্কারমুক্ত যুবকরা এগিয়ে যাচ্ছে দুস্থ-নির্যাতিত মেয়েদের জীবনসঙ্গিনী করে নেবার জন্য। ইয়াসমীনের ভাগ্যই বলতে হবে। মা-বাবা-ভাই-বোনের মৃত্যু চোখের ওপর দেখেছে। কিন্তু দীর্ঘদিন আশ্রমে থেকেও কোনো আত্মীয়ের দেখা পেল না। একদিন সুপারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে উঠেছিল রিকশায়। দেখল ঢাকা শহর তাকে ভুলে গেলেও শহরের পথঘাট, অলিগলি সে ভোলেনি। চাচার বাসার ঠিকানাটা মনেই ছিল। রিকশাটা না ছেড়েই ভেতরে ঢুকেছিল। কী যেন চাচারাও বেঁচে আছে কিনা কে জানে।

চাচা বসার ঘরে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ইয়াসমীনকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন — একি তুই? তুই বেঁচে আছিস?

ইয়াসমীন দেখল চাচার বাড়িঘর, আসবাব সবই ঠিক আছে।

চাচা আমতা আমতা করে শুকনোমুখে বললেন — তোকে তো ক্যান্টনমেন্টে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। অনেক খোঁজ করেছি।

চাচি, চাচাত বোনেরা ততক্ষণে দরজার সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। এমন বিস্ফারিত চোখে ইয়াসমীনের দিকে তাকিয়ে আছে যেন ইয়াসমীন এ পৃথিবীর মানুষ নয়। অন্য গ্রহ থেকে আশ্চর্যভাবে এসে উপস্থিত হয়েছে।

চাচা আবার বললেন — কোথা থেকে এলি?

ইয়াসমীন ঘরের বাতাসের বিপরীত গতি বুঝে ফেলেছে। শীতল কণ্ঠে জবাব দিল — আশ্রম থেকে। সেখানে আমার মতো আরো মেয়েদের এনে রাখা হয়েছে।

চাচা হঠাৎ চঞ্চল হলেন — তা এসেছিস। বেশ করেছিস। চা-টা খেয়ে যা।

ইয়াসমীন স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

— তোমরা ভালো ছিলে?

— হ্যাঁ। না। এই ছিলাম আর কি! তোদের বাড়িতে আর্মি রেইড হবার পরদিনই রিনা-

তিনাকে নিয়ে তোর চাচি গ্রামে বাপের বাড়িতে চলে গেল।

ইয়াসমীন আবার কথা বলল — তুমি জানতে ওরা আমাকে ধরে নিয়ে গেছে?

— এই দেখ, জানব না কেন? আত্মীয়স্বজন সবার মধ্যেই তো খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। সে কি প্যানিকি অবস্থা। সবার ঘরেই তো মেয়ে-বউ।

— স্বাধীন হবার পর আমার খোঁজ করলে না কেন?

— কোথায় খুঁজব। আমি কি ভেবেছি যে তুই বেঁচে আছিস?

— মরে গেলেই বোধ হয় খুশি হতে। শোনো চাচা! সবাই মরে না। যন্ত্রণার সাক্ষী হয়ে অনেককেই বেঁচে যেতে হয়।

চাচা উঠে এলো — বস্। ঠাণ্ডা হ।

ইয়াসমীন ঘুরে দাঁড়াল — বসব না। আর সবাই কেমন আছে?

চাচা বলতে শুরু করলেন কে মরেছে, কে বেঁচেছে। কার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে।

বাইরে রিকশা বেল বাজাচ্ছে। ইয়াসমীন বলল — আমি চলি।

চাচা একবার চাচির মুখে তাকালেন — এখনি যাবি? চা খেয়ে যাবি না?

একটু থেমে অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন — কেন যে তোর বাবা সেই ছোকরাকে বাড়িতে জায়গা দিয়েছিল!

ইয়াসমীন তীব্রগতিতে ফিরল — কেন খুব অন্যায় হয়েছিল বুঝি? ওদের মতো ছেলেরা যুদ্ধ করেছে বলে, আমার মতো মেয়েদের ইজ্জত খোয়া গেছে বলেই তোমার মতো লোকেরা স্বাধীন দেশে এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস নিচ্ছ।

ইয়াসমীন বেরিয়ে এসেছিল। চাচাও এসেছিলেন পেছনে — দেখ ইয়াসমীন, তুই শুধু শুধু রাগ করছিস। আমার তো ঘরে বড় মেয়ে রয়েছে। রিনা-তিনার বিয়ে দিতে হবে। শুধু আমার দোষ দেখছিস কেন? ষোলই ডিসেম্বরের পর তোর মামারাও তো বলেছিল, আমরা চাই যে ইয়াসমীন মরে যাক। ফিরে যেন ওকে আসতে না হয়।

— কেন কলঙ্কের ভয়ে? না সত্যকে স্বীকার করবার সাহসের অভাবে?

চাচা মুখ কাঁচুমাচু করলেন — শোন্, এমএ প্রিলিমিনারিটা তো পাস করেছিলি। সরকার তো বীরাঙ্গনাদের চাকরি-বাকরির সুবিধা করে দিচ্ছে। বলিস তো চেষ্টা করি। তবে আমার পরিচয়টা কোথাও দিস না।

— চাচা! আর্তচিৎকার করে উঠল ইয়াসমীন। তারপর বলল — আমি তোমার আপন ভাইয়ের মেয়ে নই? আমি তোমার দেশের মেয়ে নই? আমার পরিচয় তোমার কাছেও বীরাঙ্গনা?

— বীরাঙ্গনা তো অসম্মানের নাম নয়।

— আমি তো মনে করি নয়। কিন্তু তুমি-তোমরা আর দশজন হয়তো মনে করো। করছো।

— সে কী কথা! সবাই তো তোদের জন্য দুঃখ করে।

— বল, করুণা করে।

— ইয়াসমীন তুই অন্যরকম হয়ে গেছিস।

— হয়তো হবে। তবে আমি যে কষ্টের, যে দুঃখের, যে ভয়াবহ যন্ত্রণার দিন-মাস কাটিয়েছি, তা কাটালে তোমার আদরের রিনা-তিনাও আমার মতো বদলে যেত।

ইয়াসমীন আশ্রয়-শিবিরে ফিরে এসেছিল। আর যায়নি কোথাও পুরোনো পরিচয় বা আত্মীয়তার সূত্র ধরে। সব আত্মীয়-বন্ধুর মনের চেহারাটা সে তখন চাচার মনের আয়নায় দেখে ফেলেছে। চাচা অবশ্য একেবারে পাষণ্ডের মতো ব্যবহার করেননি। কয়েকবার এসেছেন। বলেছেন — ইয়াসমীন, ভালো একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছি। তোদের বাড়িটা অবশ্য একজন দখল করে রেখেছে। চাকরিটা তুই নিয়ে নে। বাড়ি ছাড়াবার ব্যবস্থা আমি করব।

ইয়াসমীন প্রথমে জবাব দেয়নি। পরে বলেছে — তুমিই তো বলেছ বাড়ি লুট হয়ে গেছে। পুরোনো সুতোগাছাটি পর্যন্ত নেই। আমার সার্টিফিকেটগুলোও নেই। কিসের জোরে চাকরির ইন্টারভিউয়ে গিয়ে দাঁড়াব।

চাচা করিতকর্মা। মোটামুটি ব্যবস্থা করে ইয়াসমীনকে চাকরির জন্য ইন্টারভিউ বোর্ডে পৌঁছে দিয়েছিলেন। কিন্তু তড়িতাহত হয়ে পিছিয়ে এলো ইয়াসমীন। সব জায়গায় এক পরিচয় মূলধন করে গিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে। ইন্টারভিউ বোর্ডের কর্মকর্তাদের মুখেচোখে কৌতূহলের ঔৎসুক্য। ইয়াসমীন তাদের মুখের লেখা পড়তে পারে। 'তুমি বীরাঙ্গনা, দখলদার সৈন্য তোমার ইজ্জত লুটেছে।' একবার এক ইন্টারভিউ বোর্ডে একজন প্রশ্ন করে বসেছিল, '— আপনি বীরাঙ্গনা! কেমন করে, কোথা থেকে ধরেছিল আপনাকে?'

ইয়াসমীন প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিয়েছিল। আরেকজন প্রশ্ন করেছে — কী ধরনের টর্চার করতো ওরা?

এক ধাক্কায় চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছে ইয়াসমীন — যেমন অত্যাচার নির্মম-নির্দয় পুরুষেরা মেয়েদের ওপর করে।

একটু থেমে তীব্রকণ্ঠে বলেছে — যেমন করে আমার মনের ক্ষতকে খুঁচিয়ে দেখে আপনারা কৌতূহল নিবৃত্ত করছেন, আনন্দ পাচ্ছেন!

একজন বয়স্ক কর্মকর্তা বলেছিলেন — বসুন মা। বসুন। বুঝতে পারছি আপনি মেন্টালি আপসেট আছেন।

ইয়াসমীন ধমকে উঠেছে — আপনারাই তো আপসেট করছেন। আপনারাই আমাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে দিচ্ছেন না। এই যে এখানে আরো তো মেয়ে এসেছে চাকরির জন্য, এর মধ্যে আমার সম্পর্কে আপনাদের আগ্রহের চেয়ে কৌতূহল বেশি। কারণ আমি সরকারের দেয়া বীরাঙ্গনা খেতাব নিয়ে এসেছি। আপনাদের দৃষ্টি, আপনাদের ভঙ্গি বলে দিচ্ছে যে, আমি সমাজ-ছাড়া মেয়ে। সরকার বোধ হয় বারাঙ্গনা বলতে ভুলে বীরাঙ্গনা খেতাব দিয়ে ফেলেছে।

ভদ্রলোক খসখস করে কাগজে কী লিখলেন। তারপর কাগজটা ইয়াসমীনের হাতে দিয়ে বললেন — ক্লিনিকে চিঠি লিখে দিলাম। আপনি যান মা। আপনার চিকিৎসার দরকার।

ইয়াসমীনের চোখে আগুন ঝলসে উঠল — পাকিস্তানি সৈন্যরা আমার দেহের ক্ষতি করেছে। আর আমার মনের ক্ষতি করছেন আপনারা। আপনাদের মতো মানুষেরা, যারা কিছু না হারিয়েও স্বাধীনতার ফলভোগ করছেন। শুনেছি অনেকের অনেক পদোন্নতি হয়েছে, অনেকে উঁচু আসনে উঠে বসেছে। কই তাদের নিয়ে তো কারো এত কৌতূহল নেই। অথচ আমি যখনই যে অফিসে পা রাখি, ফিসফিস গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। সারা অফিসের লোক ভিড় করে আমাকে দেখতে আসে।

ভদ্রলোকের লেখা কাগজটা তার সামনেই ছিঁড়ে ফেলে বৈশাখের রোদজ্বলা ছায়াহীন পথে নেমে এসেছিল ইয়াসমীন। তারপর ভেবেছিল এবার কোথায়? কোনদিকে যাবে। তারিকের কথা মনে পড়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে দুজন জোড়া বেঁধে ঘুরত। একই রাজনৈতিক

দল করত। তারিক বলত — 'তোমার দুঃসময়ে সবসময়ই তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াব মিনা।' কোথায় সে আজ? সেও তো যুদ্ধে গিয়েছিল। একদিনও তো সে ইয়াসমীনের খোঁজে আসেনি।

চাচা এসে বলছিলেন — আমি আর কী করব। যেখানে যাস কেবল ঝগড়া করিস। লোকে তো তোকে পাগল বলছে।

ইয়াসমীন যন্ত্রণায় মুখ ঘুরিয়ে নিল — পাগল হলেই বোধ হয় বাঁচতাম। লোকের নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতা বুঝবার মতো বোধশক্তি থাকত না।

চাচা দুঃখিত হওয়ার ভান করে বললেন — কাকে কী বলবি আর। তোর সেই বন্ধু তারিক। সেও তোর কথা বলছিল একদিন।

ইয়াসমীন চমকে উঠল — বেঁচে আছে সে?

— হ্যাঁ আছে। শুনেছি বিয়ে করেছে। আজকাল তো ছোকরাদের বিয়ে করার হিড়িক পড়ে গেছে।

ইয়াসমীন স্তব্ধ হয়ে থেকেছে। কথা বলেনি আর একটাও। পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম খবরও যেন আর বিচলিত করতে পারবে না তাকে।

চাচাই বললেন — তারিক বলছিল তোকে একটা বিয়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারলে ভালো হয়। সরকার থেকেও উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

ইয়াসমীন নিস্তব্ধ। ইয়াসমীন নির্বাক। অনেকদিন সে আর কথা বলেনি।

কথা বলতে ডাক্তারের সাহায্য নিতে হয়েছে। ভালো হতে হতে বীরাঙ্গনাদের নিয়ে হৈচৈ কমে এসেছে। লোকে নতুন উত্তেজনা পেয়ে পুরোনো উত্তেজনাকে ভুলেছে।

মর্জিনা অন্ধকারে হুরীকে বলল — ওই, ইয়াসমীন বু কেমুন দাপাইতে আছে। মুখে এট্টু পানির ছিটা দে।

মর্জিনা ম্যাচ জ্বালিয়ে কুপি ধরাল। একবাটি পানি ঢেলে ইয়াসমীনের মুখেচোখে ঝাপটা দিয়ে বলল — ও বু, এমন করত্যাছ ক্যান?

ইয়াসমীন ধীরে ধীরে সুস্থির হলো। টেনে টেনে বলল — এমন শব্দ করে কোথায় কী হলো রে হুরী?

হুরী বলল — কী জানি বুঝবার পারতেছি না।

বাড়িসুদ্ধ সবাই ঘুম ভেঙে উঠে পড়েছে। অনেক ঘরে আলো জ্বলছে। কথাবার্তা, ডাকাডাকি, নানা বয়সের মেয়েদের ভীত, উত্তেজিত আলোচনা শোনা যাচ্ছে বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে। একসময় ভোরের আজান হয়ে গেল। অন্ধকার কেটে মেঘলা আকাশের আবছায়ার গলিতে আলোর আভাস জাগল। ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সবাই। ব্যাপারটা বুঝতে তখন কারোই বাকি নেই। প্রবল বর্ষণে ভাঙা পুরোনো বাড়ির এক অংশের ছাদ ধসে ভেঙে পড়েছে। ইট-কাঠ-লোহালক্কড়ের নিচে চাপা পড়েছে তিনটি মেয়ে — পিরু, পারুল আর মমতা।

ক্রমে সারাটা বাড়িতে উত্তেজনা ছেয়ে গেল। লোক ভেঙে পড়ল গলিতে। পাংশুমুখে ভেঙে-পড়া ইট-কাঠের ভগ্নস্তূপে তাকিয়ে মেয়েরা পিরু, পারুল, মমতার ভাগ্যের কথা আলোচনা করে নিজেদের ভবিষ্যতের আশঙ্কাকে চাপা দিতে ব্যস্ত হলো। যে-কারো ঘর এমন বৃষ্টিতে ভেঙে পড়তে পারে তা তারা জানে। তবু সেটা এই মুহূর্তে মনে আনতে সবাই শিহরিত হলো।

বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি ধরে এলো। ফাঁড়ি থেকে পুলিশের লোকজন এলো। একটু পরেই দমকল বাহিনীর লোকজন এসে পড়ল। মজুর নামিয়ে দেয়া হলো ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে চাপা পড়া মেয়েদের উদ্ধার করার কাজে।

জাহানআরা শুধু বলল — ওই তিনডা কি আর বাঁইচ্যা আছে! ঘর ভাইঙ্গা পড়ছে কাইল রাইতে আর আজ দুপুর বেইল বাদে সাফাই শুরু হইল।

অনুমানটা জাহানআরার একার নয়। সবাই ভাবল ‘ওরা আর বেঁচে নেই।’

পিরু, পারুল, মমতার থেঁতলানো রক্তমাখা মৃতদেহ এনে শুইয়ে দেওয়া হলো গলির মাঝখানে। সবাই ভিড় করে নির্বাক ভীত চোখে তাকিয়ে রইল। পাগলি রহিমন চিৎকার করে উঠল — কী দ্যাহে? কী দ্যাহে সবটিতে? এই হাল একদিন সবটির হইব। কাইল অরা আছিল। ঘরে মানুষ বহাইছে। আইজ নাই। আ-লো, আমরা তো মানুষ না। মানুষ হইলে কি এমনে মরে! কুত্তা-বিলাইও আমাগো থিকা ভালো।

এখানে-ওখানে জটলা করতে থাকা মেয়েগুলো শুকনোমুখে উদাস হলো। রহিমনের প্রলাপ আর এখন পাগলের প্রলাপ মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সত্যি এমন অনিশ্চিত জীবন তাদের। না খেয়ে ধুঁকে ধুঁকে শরীর-সর্বস্ব হয়ে বেঁচে আছে তারা। যে-কোনো মুহূর্তে কেউ

তাদের মেরে ফেলতে পারে। মেরে ফেলতে পারে ছুরির ঘায়ে, ব্যাধি দিয়ে, ঘর চাপা ফেলে। সত্যি তারা বোধ হয় মানুষ না।

মাসি বিষণ্ণমুখে বলল — মমতাটার উঠতি বাজার আছিল। কপালে সইল না। লোকসান গেল হীরুরও।

ফুলমতী ইতিমধ্যে মজুরদের একজনকে হাত করবার চেষ্টায় লেগে গেছে। বলছে — কাম শ্যাষ হইলে আইও। পাঁচ টাকার বেশি নিমু না।

কাজ করতে করতে লোকটা তিন টাকায় রফা করে ফেলল। পিরু, মমতা, পারুলের লাশ তখনও গলিতে। বিকেলের আগে পুলিশের গাড়ি লাশগুলো নিয়ে গেল।

বকুল বলল — অগো লাশ অহন কাইটা-ফাইড়া দশখান করব।

শান্তি শুষ্কমুখে প্রশ্ন করল — তারপর?

বকুল জবাব দিতে পারল না। তারপর কী তা কেউই সঠিক জানে না।

পুলিশ, দমকলের লোক, মজুরেরা চলে যেতে যেতে সন্ধ্যা নামল। মেয়েরা নিষ্প্রাণ যান্ত্রিকতায় সাজগোজ করে ঘরে আগরবাতি জ্বালাল, শরীরে একটু বেশি করে মাজারের পড়া-পানি ছিটিয়ে গলিতে দাঁড়াল। যদিও আজ এমন একটা দুর্ঘটনায় সবাই কমবেশি বিচলিত, তবু গলিতে দাঁড়াতে হবে। খরিদ্দার ধরতে হবে। তা না হলেই দুর্দশা। মান্নান ক্ষিপ্র হাতে পানের খিলি সাজিয়ে গোলাপপানির ছিটা দিল। ছেরুর দোকানে হিজড়ারা ঢোল নামিয়ে রেখে উদ্বিগ্ন শুকনোমুখে বিড়ি ফুঁকছিল। ছেরু বলল — আরে উদাইয়া গেলি ক্যান সব। উঠ্ নাচ-গান ধর। কইরে নাবু, রকি — উঠ তরা।

ওরা উঠে দাঁড়িয়ে শরীর দুলিয়ে ফিল্মি গান ধরল। দু'চারজন দেশি মদের খরিদ্দার এসে জুটল।

হুরী একজন খরিদ্দারের জামা ধরে টেনে নিল। লোকটা তাড়ি খেয়ে নেশা করে এসেছে। টেনে টেনে বলল — কিরে মাগি! ঘর চাপা দিয়া মারবি না তো? বিশ্বাস নাই শালার এই ভাঙ্গা বেশ্যাবাড়ির।

হুরী লোকটাকে ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে দিল।

মর্জিনা গলির ধারে দাঁড়িয়ে মুখ বাঁকাল — বেশ্যাও চাই। আবার জানেরও ডর। পরানের দাম খালি তগো আছে, আমাগো নাই খানকির পুতেরা।

তবু শেষবেলার ভাঙা হাটের মতো পাড়াটা কিছু জমে উঠল। বেচাকেনা টাকা-পয়সার লেনদেনে যদিও সবাই ভুলে গেল আজ তিনটি মেয়ের অপমৃত্যু হয়েছে এ পাড়ায়। তবু সবারই বুকটায় একটা অনিশ্চয়তার কাঁটা খচখচ করে সবাইকেই অন্যমনস্ক করে দিতে লাগল বারবার।

॥ ৭ ॥

দেলোয়ার আজকাল প্রায়ই আসে। মর্জিনা, হুরী, শান্তি, বকুল, কুসুম সবার সঙ্গেই ওর যেন একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়ে গেছে। ওরা আড়ালে বলে ইয়াসমীন বুর মানুষ। কিন্তু কথাটার ওপর গুরুত্ব দেয় না কেউ। দেলোয়ার বেশিরভাগ সময় দিনেই আসে। মেয়েদের এটা-ওটা কিনে উপহার দেয়। চা-সিগারেট খেতে খেতে ইয়াসমীনের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করে। সেসব গল্পের অধিকাংশই ওরা বোঝে না। তবু লোকটাকে ওরা পছন্দ করে। কারণ লোকটা আর সব পুরুষের মতো নয়। মর্জিনা বলে — দিলু ভাই কি ইয়াসমীন বুরে বিয়া করব নি লো হুরী?

হুরী ভেংচি কাটে — কী যে কস তার ঠিক নাই। বেশ্যার লগে খাতির হইলেই বুঝি বিয়া হয়!

মর্জিনা হার মানে না — হয় না বুঝি। ওই তো ওই রূপারে বাইর কইরা নিল এক নাগরে। বিয়াও করছে।

হাসতে থাকে মর্জিনা। সিগারেট টানতে টানতে হুরীও হাসে। হাসির অবশ্য কারণ আছে। রূপাকে যখন একজন এ পাড়া থেকে বের করে নিল তখন সবারই দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল। মনে মনে রূপার ভাগ্যকে হিংসা করেছিল সবাই কমবেশি। রূপা ক'মাস পরে ফেরত এলো। কাজী সাহেবের কাছ থেকে পুরো একটা ঘর ভাড়া নিয়ে চলে গেল। এখন প্রায়ই রূপা আসে। চকচকে শাড়ি আর ইমিটেশনের গয়না পরা রূপা বোরকা চড়িয়ে স্যান্ডেল ফটফটিয়ে এসে আঁচলের চাবি দিয়ে ঘরের তালা খোলে। আগরবাতি জ্বালায়।

কে যেন বলেছিল — কিরে রূপা! সাধের সংসারে মন বইল না? রূপা চটপট উত্তর দেয় — বাড়িতে তো আর বহি নাই। পাড়ায় আইয়া ঘরভাড়া লইছি। কী করুম, স্বামীর কামাইতে তো সংসার চলে না। কত ভদ্দরঘরের বউরা তো শহরের মধ্যে পেরাইভেট

প্রাকিটশ করে।

ওদিকে সংসার, এদিকে পাড়ার খরিদ্দার — এই দুইয়ের মধ্যেই মানিয়ে চলেছে রূপা।

টুলে বসে পা দুলিয়ে মর্জিনা বলল — ছ্যাপ দেই অমুন বিয়ার কপালে।

ঘরে দেলোয়ার ছিল। ওদের কথা দেলোয়ারের কানে গেল। বলল — বিয়েকে ওরা এত ঘেন্না করে কেন?

ইয়াসমীন হাসল — বিয়েকে নয়। বেশ্যার বিয়েকে। যেমন আমি করি।

দেলোয়ার চুপ করে গেল। ইয়াসমীনের অতীতটা এখন ওর সম্পূর্ণ জানা। দেলোয়ার জানে ইয়াসমীনকেও একজন সেই দুস্থ নারী কেন্দ্র থেকে বিয়ে করে নিয়ে গিয়েছিল। সেই মহৎ উদ্দেশ্যের বিয়ের খবর ফলাও করে ছাপা হয়েছিল খবরের কাগজে। কিন্তু বিয়ের আসল উদ্দেশ্যটার স্বরূপ অল্পদিনেই প্রকাশ পেয়েছিল ইয়াসমীনের কাছে। ইয়াসমীন জেনেছিল সেই তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকটির বিয়ে করা বউ আছে দেশের বাড়িতে। ইয়াসমীনের বাবার বাড়িটা দখলমুক্ত করেছিল লোকটা। আর কী আশ্চর্য! সেই বাড়ির ভাগের অংশ দাবি করে মামলা করেছিলেন চাচা। লোকটার সঙ্গে চাচার কী রফা হয়েছিল ইয়াসমীন জানে না। ইয়াসমীনকে দিয়েই বাড়িটা বিক্রি করিয়েছিল সে। তারপর ধরেছিল আসল মূর্তি। ইয়াসমীনকে জোর করে সে গলায় মদ ঢেলেছে। বন্ধুবান্ধব নিয়ে সারারাত ধরে বিয়ে করা বউকে নিয়ে যৌথভাবে স্ফূর্তি করেছে।

ইয়াসমীন বাধা দিয়েছে, কেঁদেছে, ঝগড়া করেছে। কিন্তু নিরুপায় ইয়াসমীনের বদলে জুটেছে নিষ্ঠুর প্রহার। লোকটা ব্যঙ্গ করেছে — পাঞ্জাবি ব্যাটাদের সঙ্গে যদি শুতে পারো তবে এসব পারবে না কেন?

ইয়াসমীন নির্বাক হয়ে গেছে। নিত্যনতুন লোক এনেছে সে। ইয়াসমীন শুনেছিল, তারা সবাই বিখ্যাত হোমরাচোমরা লোক। ইয়াসমীনের দেহের বদলে লোকটা বড় বড় ব্যবসা পেয়ে দেদার পয়সা লুটেছে।

আলাদা বাড়ি তৈরি করে দেশ থেকে বউ, মা-বোনকে নিয়ে এসেছে।

ইয়াসমীন একদিন গিয়েছিল চাচার কাছে। চাচা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। জানিয়েছেন, নষ্ট চরিত্রের মেয়েকে বংশ-পরিচয় দিতে তার লজ্জা হয়।

মামার কাছে গিয়েছিল। মামা-মামি মুখ কুঁচকেছেন। যেন ইয়াসমীন একটা নরকের

কীট। যেন তার মুখ দেখাও পাপ। মামা কেবল শীতলকণ্ঠে বলেছেন — বাড়িটা বিক্রি করে তোমার চাচাকে তার ভাগের টাকা দিয়ে দিয়েছ। এখন আমার কাছে এসেছ কেন? তাছাড়া আগে যা হয়েছে, হয়েছে। এখন তো সমাজে তোমার খুব সুনাম নেই।

চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয়েছে, কে সেই সমাজ! যে সমাজ একটি নিঃসহায় মেয়েকে সাহায্যের হাত বাড়ায়নি, সে সমাজকে পারলে ইয়াসমীন খুন করত। একটি মেয়ের জীবনের বিনিময়ে যে সমাজ স্বাধীনতা কেনে, যে সমাজ প্রতিপত্তি কেনে তাকে ইয়াসমীন ঘৃণা করে। প্রচণ্ড অভিমান, জ্বালা আর বিদ্রোহ নিয়ে ইয়াসমীন বাড়ি নামক সেই যন্ত্রণার কারাগারে ফিরেছিল। ঘরে ফিরে দেখেছে দুজন সুবেশধারী পুরুষের সঙ্গে মধ্যপানে রত তার স্বামী। ইয়াসমীনকে দেখে রেগে উঠল সে — এমন বিশ্রীভাবে কোথায় গিয়েছিলে? যাও কাপড় পাল্টে এসো। এদের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জে যেতে হবে।

ইয়াসমীন দরজা ধরে দাঁড়িয়ে অবিচল দৃঢ়তায় বলল — হ্যাঁ যাব। তবে নারায়ণগঞ্জে নয়।

ইয়াসমীনের স্বামী উঠে এল — এসব কী বলছ। ওখানেই তো পার্টি।

একজন অতিথি ইয়াসমীনের শরীরে দৃষ্টি বুলিয়ে বলেছিল — চার্মিং ওম্যান। চলো আর দেরি নয়।

ইয়াসমীন অনড় — যাবো, তবে তোমাদের সঙ্গে নয়।

ইয়াসমীনের স্বামী বিরক্তকণ্ঠে বলল — বাজে বকো না। জানো এরা কারা?

ইয়াসমীন দাঁড়ায়নি। প্রচণ্ড একটা ঝোঁকে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নামতে নামতে তার মনে হয়েছিল সেদিনের সেই যুদ্ধে এ দেশটা, এ সমাজটা কেন ভেঙে-গুঁড়িয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশে যায়নি।

ইয়াসমীনের স্বামী চিৎকার করে ডাকছিল। ইয়াসমীন থামেনি।

রিকশায় উঠে আপনমনে বিড়বিড় করেছিল — 'যুদ্ধ যদি আমাকে বেশ্যাই বানাল, তবে তার ফলভোগ ওই ক্রিম খাওয়া লোকদের করতে দেব না। আমি বেশ্যা। আমি বেশ্যা হয়েই যাব।'

ইয়াসমীন এসে উঠেছিল এ পাড়ায়।

দেলোয়ার খুব আস্তে বলল — ইয়াসমীন, আমি বুঝতে পারি বাইরের পৃথিবীর ওপর

তোমার দারুণ অভিমান।

ইয়াসমীন সোজা চোখে তাকাল — অভিমান বল না। বল ঘৃণা।

— মানলাম ঘৃণা। কিন্তু নিজেকে ধ্বংস করে লাভ কি? তুমি তো পাড়ার অন্য মেয়েদের মতো হয়ে আসনি?

ইয়াসমীন হাসল — অনেক বড় বড় কথা বলে মাথাটা গরম করে দিয়েছ। আজ একটু দেশি মদ খেতে হবে। খাওয়াবে?

দেলোয়ার জবাব দিল না। ইয়াসমীন বলল — ধ্বংস শুধু নিজের নয়, সবারই ধ্বংস চাই আমি। ধ্বংসের মধ্য দিয়েই একদিন নতুন জীবন আসবে।

ইয়াসমীন একটু থেমে কণ্ঠস্বর বদলে বলল — সিগারেট দাও একটা।

দেলোয়ার সিগারেট ধরিয়ে দিল। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ইয়াসমীন কথা বলল — আমি তো মানুষ নই, মানে তোমাদের সমাজের লোক নই। আমি এ পাড়ার মেয়েদের একজন। যারা নিজেদেরকে মানুষ ভাবতে পারে না। ভাবতে ভুলে গেছে।

দেলোয়ারের দৃষ্টি ব্যথিত হলো — ইয়াসমীন, তুমি তো ওদের দিনরাত বোঝাচ্ছ যে ওরাও মানুষ। ওদের বোঝাও যে মনুষ্যত্বের অধিকার ওদের অর্জন করতে হবে।

ইয়াসমীনের ঠোঁট বিদ্রূপে বাঁকা হলো — কারা অর্জন করবে? যারা কতগুলো পশুর তৈরি কারাগারে বন্দি?

— ইয়াসমীন, ঠাট্টা করো না। আমি জানি তুমিই পারবে। তোমার মধ্যে এক আশ্চর্য শক্তি দেখেছি আমি। তুমি কি জানো না যে পরিবর্তনের আলোড়ন জাগলে সব কারাগারের কঠিন দেওয়ালই ভেঙে পড়ে।

ইয়াসমীন হঠাৎ সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে সোজা হয়ে বসল — কখন সেই আলোড়ন জেগে ওঠে, বলতে পার?

— পারি। যখন অন্যায়-অবিচার আর অত্যাচার তার সর্বোচ্চ সীমায় ওঠে।

ইয়াসমীন অদ্ভুত বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসতে লাগল।

দেলোয়ার উঠল — আমি চলি। এবার তো তোমাদের খরিদ্দার আসতে শুরু করবে।

জাহানআরা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে দেলোয়ারকে দেখল। ময়নাকে ডেকে বলল — ও ময়না! ওই ব্যাটা দেহি এ পাড়ায় জমাইয়া বইছে। সবটির লগেই খাতির।

ময়নার এখন দোকান খুলতে যাবার ব্যস্ততা। ক্ষিপ্র হাসিতে বলল — ও বু, শোনো নাই ওই ব্যাটা কী কয় মাইয়াগো?

জাহানআরা ভ্রূ কুঁচকাল — কয়ডা কী?

ময়না চোখ ঘুরিয়ে ঠোঁট বাঁকাল — চিরডা কাল শুইনা আইলাম বেশ্যারা খারাপ কাম করে। বেশ্যাগো ইহজনমও কালা। ওই জনমেও জ্বালা। ওমা, ব্যাটায় বলে সবটিরে কয় — 'তগো কিসের গুনা? মাইনষে তগো খারাপ করছে। তরা তো ইচ্ছা কইরা খারাপ হস নাই? তগো লিগা জবাব যদি দেওন লাগে তো সব মানুষেরই দেওন লাগব!'

জাহানআরার আর বাজে প্রলাপ শুনবার সময় নেই। ঘরে চলে গেল সে। কানা গলিটায় রূপসী অন্ধকার নেমেছে। জাহানআরা ঘরে আগরবাতি ধরাল। আজ একজন শাঁসাল খরিদ্দার আসবার কথা আছে। কাঞ্চন খবর দিয়ে গেছে। অবশ্য জাহানআরার সব খরিদ্দারই শাঁসাল। উকিল, সাংবাদিক, কবি, মুহুরি, ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকেরাই জাহানআরার গুণমুগ্ধ। এছাড়াও উঁচুদরের ক্ষমতাশালী খরিদ্দার আছে তার। দুপুরের শাড়ি ছেড়ে লাল রঙের লেসের ব্রেসিয়ার পরল জাহানআরা। নতুন কেনা লাল শিফন বিছানায় রাখল। শাড়িটা রাখতে গিয়েই হাতের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। দু'হাতে থোকা থোকা গোটা ফুটে উঠেছে। বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। এ লক্ষণ এ বাড়ির সবাই চেনে। জাহানআরাও জানে। তবে কি ... না, না, এ হতে পারে না। মনে মনে দুর্বল হয়ে গেল জাহানআরা। এ পাড়ায়, এ ব্যবসায় কেনই বা এটা হতে পারে না? দ্রুত কম্পিত হাতে শাড়ি-ব্রেসিয়ার সরিয়ে নিজের শরীর পরীক্ষা করতে শুরু করল জাহানআরা। নাহ্, কোনো সন্দেহ নেই। শরীরেও লক্ষণ ফুটে উঠেছে। রোগের নিদারুণ আশঙ্কা নিয়ে অন্ধকার ঘরে বোবার মতো বসে রইল সে। এ বাড়িতে অনেক মেয়েই এই ব্যামোতে ভুগছে। নোংরা কুৎসিত ব্যাধি যতদিন পারে লুকিয়ে রেখে তারা ব্যবসা করে। শেষ পর্যন্ত রোগটা চাপাচাপি থাকে না। শরীরে ফুটে বেরোয়। যৌবনের ওপর কে যেন নিষ্ঠুর দস্যুর মতো হাত বাড়িয়ে সব লাবণ্য ছিনিয়ে নিয়ে যায়। গরলের মতো ঘায়ে সারা শরীর থক থক করে। নাক খসে যায়। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে জাহানআরা দেখেছে, কত মেয়ে ব্যবসায় নেমে ব্যাধি-আক্রান্ত হয়ে পচে-গলে মরেছে। কতজন পাগল হয়েছে। কেউ গলায় ফাঁসি দিয়েছে। জাহানআরারও তেমন দশা হবে! ভক্তের দল নাক কুঁচকে সরে যাবে। বাইরে থেকে দামি

ডাক আসবে না। জাহানআরার রোজগার কমে যাবে। সবার দয়ার, করুণার পাত্রী হবে সে। আর ভাবতে পারে না সে। বিছানায় উপুড় হয়ে হাত দিয়ে বালিশ আঁকড়ে ধরে কাঁপতে শুরু করল জাহানআরা। মনে হলো তার সারা শরীর কাঁপিয়ে যেন ভীষণ একটা ভয়ের জ্বর আসছে।

বাইরে কাঞ্চনের কণ্ঠ শোনা গেল — জানি! ওই জানি! সন্ধ্যায় ঘর আন্ধার কইরা থুইছস ক্যান?

জাহানআরা দ্রুত উঠে বসে শাড়ি তুলে হাত-পা ঢেকে বলল — ঘরে আয় কাঞ্চন।

কাঞ্চন ঘরে এলো। বলল — কী হইছে রে জানু?

জাহানআরা একটু চুপ করে রইল। তারপর ভারি বিষণ্নকণ্ঠে বলল — আইজ আর মানুষ বহামু না। শরীলডা ভালো লাগে না।

কাঞ্চন রেগে গেল — সবই তর মর্জিমাফিক হইব নিকি? কত পয়সাওয়ালা বড়দরের কাস্টমার ধইরা নিয়া আইলাম। অহন তুই মানা করলেই চলব?

জাহানআরা রাগল না। ক্লান্তস্বরে বলল — আইজ পারুম না। তুই মানা কইরা দে।

কাঞ্চন জাহানআরার হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে উঠিয়ে দিল। বলল — দ্যাখ জানি, তর মেজাজখান দিনদিন যেমুন হইতাছে তাতে কইলাম তরই ক্ষতি হইব। আমি হৈঠলের দালালের লগে কথা কইয়া এত দরের মানুষটা ঠিক করলাম। আমারে আগাম কমিশন দিছে। অহন আউলাপাথালি কথা কস! উঠ। ঘরে বাতি দে। আমি যাই। তারে হোটেল থনে সঙ্গে কইরা আনন লাগব।

কাঞ্চন বেরিয়ে গেল। অবসন্ন শরীরে জাহানআরা উঠল। ঘরে আলো জ্বালিয়ে দামি শাড়ি-পেটিকোট পরে মুখে-হাতে পাউডারের প্রলেপ দিতে বসল। এতদিন পরে তার কেন যেন নিজের ওপর, এই ঘরের ওপর, তার জমজমাট ব্যবসার ওপর বিতৃষ্ণা হলো। প্রসাধন শেষ করে আশঙ্কিত মনে তাকের ওপর থেকে মদের বোতল নামাল সে। বোতলটা প্রায় খালি, অল্প একটু তলানি পড়ে ছিল। তাই গলায় ঢালতে ঢালতে জাহানআরার চোখ সজল হয়ে উঠল। বিড়বিড় করল সে — রহিমনের মতো জানি তুই এইবার মরবি। পইচ্যা গইল্যা মরবি। গলির কুত্তাডাও তরে ফিরা দেখব না।

নিজের প্রতি সমবেদনায় নিজেই আকুল হয়ে কেঁদে উঠল জাহানআরা একা ঘরে।

॥ ৮ ॥

গলিতে দাঁড়িয়ে কুসুমের শরীরটা খুব ক্লান্ত লাগছিল। মাস কয়েক হতে চলল কুসুমের শরীর ভালো যাচ্ছে না। রোজ সকাল-বিকাল ঘুষঘুষে জ্বর হয়। খুক খুক করে কাশে কুসুম। বুকে-পিঠে কেমন এক ব্যথা চাপ ধরে থাকে। সকালে ঘুম থেকে উঠে ঝিম ধরে বসে থাকে অনেকক্ষণ। কয়েকদিন কাশির সঙ্গে রক্ত উঠেছে। কাউকে বলেনি কুসুম। তবু অবসন্ন দেহটা নিয়ে গলিতে দাঁড়াতে হয় রোজ। মানুষ বসাতে হয়। কুসুমের শরীরটা অনেক রোগা হয়েছে আগের চেয়ে। একটা খরিদ্দার ধরতে অনেক কলাকৌশল ও পরিশ্রম করতে হয়। কাল, পরশু দুদিন লোক পায়নি কুসুম। দিন দুটো একরকম উপোসই গেছে। তার ওপর কালুর অত্যাচার কুসুমের আর ভালো লাগে না। কুসুম আর পারে না। আজ ভাগ্যগুণে গলিতে দাঁড়াতেই একটা লোক পেয়ে গেল কুসুম। তিন টাকা রফা হলো। কুসুম পাঁচ টাকা চেয়েছিল। লোকটাকে নিয়ে এগিয়ে এলো কুসুম। জরিনার ঘরটার ভাড়া বেশি এখন। সেই জন্য কুসুমকে ইয়াসমীনদের ঘরে নিয়ে এসেছে কালু। ঘরের দরজা বন্ধ। বোধ হয় ইয়াসমীনের লোক আছে ঘরে।

হুরী, মর্জিনা এখন গলিতে দাঁড়িয়ে দরাদরি করছে। ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল কুসুম — ও বু, তাড়াতাড়ি বাইরাও। আমার মানুষ খাড়াইয়া রইছে।

কুসুমের মানুষ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। দরজার সামনেই কুসুমের রুগ্□ণ-শীর্ণ ছেঁড়া-ময়লা কাপড়-পরা শরীরটা চেপে ধরল বুকে। লোভীর মতো হাত সঞ্চালন করতে লাগল কুসুমের সারা শরীরে। লোকটা হঠাৎ বলল — তর শরীর এত গরম ক্যানরে?

কুসুম চমকে উঠল। ভয় পেল। কী যেন কুসুমের অসুখ শুনে লোকটা যদি কেটে পড়ে! কুসুম কণ্ঠে ঝরঝরে ভাব আনল। পটীয়সী বারাঙ্গনার মতো লোকটার ঠোঁটে জ্বরতপ্ত ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল — গতরডা সবসময় আমার গরমই থাকে। একটু থেমে কোটরাগত চোখে বিলোল কটাক্ষ ফুটিয়ে বলল — মরা মাছের নাহাল ঠাণ্ডা মাইয়া মানুষ ভালো নিকি বড়!

ইয়াসমীন দরজা খুলছে না। ভেতরে যেন কিসের উত্তপ্ত বচসা চলছে। ইয়াসমীন চিৎকার করে ঝগড়া করছে। সঙ্গে থেকে থেকে পুরুষের কণ্ঠ। কুসুম অবাক হয়ে গেল। ইয়াসমীন বু তো কারো সঙ্গে ঝগড়া করে না! খরিদ্দারের সঙ্গে তো নয়ই। দরজায় কান পেতে ইয়াসমীনের উত্তপ্ত কণ্ঠ শুনল কুসুম — কেন সেদিন যুদ্ধ করেছিলে, কার জন্য?

মর্জিনা একজন লোক নিয়ে এসে দাঁড়াল। বলল — কিরে কুসুম, তুই অহনও খাড়াইয়া রইছস দেহি। ঘর একজন এতক্ষণ আটকাইয়া রাখলে আমরা মানুষ বহামু কখন?

দরজায় গুম গুম করে কিল মারল মর্জিনা — ও বু? দুয়ার খুল। আমাগো টাইম যায়।

তবু দরজা খুলল না। ভেতরে কেমন ধস্তাধস্তি, হুড়োহুড়ির শব্দ। মর্জিনা, কুসুম দু'জনই ভয় পেল। হুরীও কোথা থেকে ছুটে এলো। তিনজন একসঙ্গে ধাক্কা দিতে লাগল। ভাঙা দরজার একটা পাট কড়াৎ করে কব্জা খুলে ঝুলে পড়ল। ভেতরে তাকিয়ে তিনজনই শিউরে উঠল। ভালো জামাকাপড় পরা একজন যুবক দু'হাতে মাথা চেপে বসে আছে। তার কপাল কেটে রক্ত গড়িয়ে সারা মুখ ভেসে গেছে। এক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে গেল তিনজনই। কুসুম আর মর্জিনার মানুষ ব্যাপার দেখে কেটে পড়েছে নিঃশব্দে। আঁচল লুটিয়ে বেড়ায় পিঠ ঠেকিয়ে হাঁপাচ্ছে ইয়াসমীন। ইয়াসমীনের এমন চেহারা মর্জিনা, হুরী, কুসুম কেন, এ বাড়ির কেউ কোনোদিন দেখেনি। মেঝেতে একটা ভাঙা বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে। মর্জিনা ভেতরে ঢুকে কুপির আলোয় লোকটাকে ভালো করে লক্ষ করল। ভালো ভদ্রলোকের ছেলেই তো মনে হয়। পরনে দামি প্যান্ট-শার্ট, বেল্ট। বাবরি চুল। জুলফি-গোঁফ। তরুণ সুপুরুষ একজন। এমন লোকের কপালে রক্ত এলো কেমন করে! কেমন করে কাটল কপাল। তবে কি ইয়াসমীনই? আর লোকটাই বা ও-রকম চোরের মতো মাথা গুঁজে বসে আছে কেন? রক্তে শৌখিন দামি শার্ট ভিজে যাচ্ছে। ইয়াসমীনকে আস্তে প্রশ্ন করল মর্জিনা — কী হয়েছে বু?

ইয়াসমীন মুখ ফিরিয়ে তীব্রকণ্ঠে বলল — দেখ, চেয়ে দেখ। ওর মাথায় বোতল ভেঙেছি আমি। পারলে ওকে খুন করতাম।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে রাগ আর উত্তেজনা চাপল ইয়াসমীন। বলল — বেশ্যাবাড়িতে মেয়েলোক নিয়ে ফুর্তি করতে এসেছ? কত টাকা লুট করে জমিয়েছ কামাল?

লোকটা একবার চকিতে মুখ তুলে আবার নামিয়ে নিল। কিছু বলল না। মর্জিনা, হুরী, কুসুম হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ইয়াসমীন যেন জ্বলে যাচ্ছে। জ্বালাভরা কণ্ঠে আবার বলল — খবর কাগজে অনেক হাইজ্যাক, অনেক ব্যাংক লুট, অনেক অরাজকতার খবর পড়ি, শুনতে পাই কিছু বিপথগামী তরুণ আছে এই দলে। তুমিও...

কামাল মুখ তুলল — ইয়াসমীন, তুমি আমাকে যা খুশি তাই করতে পার। কিন্তু সত্যি

আমি জানতাম না আমার জন্যই তোমার আজ এই অবস্থা।

ইয়াসমীন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল — আমার যা হয়েছে তা নিয়ে এখন আর তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে। আজকের যে তোমাকে দেখছি সে তোমাকে আমরা বাড়িতে আশ্রয় দেইনি। আমরা আশ্রয় দিয়েছিলাম একজন মুক্তিযোদ্ধাকে। যে দেশের জন্য, সবার জন্য যুদ্ধে গিয়েছিল। যার জন্য সেদিন মা-বাবা, ভাই-বোন সবাইকে হারিয়েছি। আর আমি হয়েছি বেশ্যা।

কামালের কণ্ঠে ক্ষোভ-দুঃখ একাকার হলো — ইয়াসমীন, যারা তোমাকে বেশ্যা বানিয়েছে, তারাই আমাকে ধ্বংস করেছে। আমি আজ হাজার হাজার টাকার জুয়া খেলি। মদ খেয়ে পচে যাচ্ছি। আমি নারীমাংসের স্বাদে জীবন খুঁজছি। আমি — আমি তো এমন নাও হতে পারতাম। যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবার পর কারা আমাকে ঠেলে দিয়েছিল এমন পথে?

ইয়াসমীন স্থিরদৃষ্টি ফেলল কামালের মুখে — ওকথা বলে বিবেককে ধোঁকা দিও না কামাল। দেশে আরো অনেক মুক্তিযোদ্ধা আছে, যারা তোমার মতো হয়ে যায়নি। তারা এখনও সুস্থ মানুষ।

কপালের রক্ত গড়িয়ে পড়ছে কামালের গালের পাশ দিয়ে। অসম্ভব যন্ত্রণার্ত কণ্ঠে কথা বলল সে — তোমার কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু এও জানি তোমার অবস্থার মূলে যদি আমি থেকে থাকি তা তুচ্ছ হয়ে গেছে সমাজের অবিচারে। যে সমাজ তোমাকে সহজ করে নিতে পারেনি, সেই সমাজেরই একটা অংশ আমাদের মতো হতাশ ছেলেদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ঠেলে দিয়েছে ধ্বংসের পথে। আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি আত্মধ্বংসের মধ্য দিয়ে।

ইয়াসমীন বিচিত্র হাসল — পুরুষ তো মেয়েদের মতো শৃঙ্খলাবদ্ধ জীব নয়। যে পুরুষ তার শক্তিকে অন্যায় আর অবিচারের প্রতিবাদে কাজে লাগাতে পারে না, তার মরাই উচিত।

কামাল চমকে চোখ তুলল। তারপরই দৃষ্টি নামিয়ে নিল। ঘরের সামনে ততক্ষণে বেশ ভিড় জমে গেছে। সারাবাড়ি রটে গেছে ইয়াসমীন মদের বোতল ভেঙেছে খরিদ্দারের মাথায়! মাসি এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল দরজায় — কী লো মাইয়া! এই সব কী?

এমুন করলে তো পাড়ার বদনাম হইয়া যাইব।

কামাল চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়াল।

ইয়াসমীন এগিয়ে এলো — দাঁড়াও। কপালটা মুছে চলে যাও।

শাড়ির একফালি ছিঁড়ে কামালের মুখের রক্ত মুছিয়ে দিল ইয়াসমীন। তারপর বলল — যাও। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। খুব বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট।

কামাল মাথা নিচু করে ভয়ানক অপরাধী ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এলো মাসি — কিরে? বেশি নেশা করছিলি নাকি?

মাসিকে নয়, যেন নিজেকে শুনিয়ে বলল ইয়াসমীন — না। অনেকদিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল। আর আজ একটা দুর্ঘটনা ঘটল।

মাসি বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে গেল — নেশা কইরা ছেড়ি ইংরাজি বুলি কইত্যাছে।

ভয়ংকর যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হতে হতে ঘর থেকে বের হলো ইয়াসমীন। আঁচলে কামালের কাছ থেকে পাওয়া নোটগুলো বাঁধা। কী করবে ইয়াসমীন এ অভিশপ্ত টাকা দিয়ে। ছিঁড়ে কুয়োয় ফেলে উড়িয়ে দেবে? তাই বা দেবে কেন? হতে পারে এটা একজন ধ্বংসস্তূপে তলিয়ে যেতে থাকা মুক্তিযোদ্ধার অসৎ টাকা। কিন্তু ইয়াসমীনের তো এটা রোজগারের টাকা। হাঁটতে হাঁটতে ফুলমতীর ঘরের সামনে এলো ইয়াসমীন। ফুলমতী লোক বসায়নি। বোধ হয় জোগাড় করতে পারেনি। চাটাইর ওপর ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়ে সে ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে। পা ছড়িয়ে এক হাতে উকুন খুঁজতে খুঁজতে আরেক হাতে ছেলের পিঠে আলতো চাপড় মেরে গুন গুন করে বেসুরো কণ্ঠে ঘুমপাড়ানি গাইছে। নোংরা ঘরে কালি-পড়া কুপির আলোয় অভুক্ত, দুস্থ বেশ্যা ফুলমতীর মুখটা আশ্চর্য কোমল মনে হচ্ছে। যেন ফুলমতী অভুক্ত, দরিদ্র বেশ্যা নয়, ফুলমতী মা। শুধুই মা। এ সন্তানের বাবা কে ফুলমতী জানে না। নরম চোখে মৃদুকণ্ঠে গান গাইতে গাইতে ফুলমতী একটা ম্যাডোনার ছবি হয়ে গেছে। ইয়াসমীনের মনের জ্বালায় চমৎকার শান্ত প্রলেপের হাওয়া বয়ে গেল। ইয়াসমীন তাকিয়ে রইল ফুলমতী আর ওর বাচ্চার দিকে।

এই বাড়িতে, এই শহরে, এই দেশে, এই পৃথিবীতে কোটি কোটি মা সন্তানকে ঘুমপাড়ানি শুনিয়ে স্বপ্ন দেখছে, এরা মানুষ হবে। বড় হবে। হয়তো কতজন হারিয়ে যাবে। আবার তারই মধ্যে কয়েকজন মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। মানুষ হবে। শুধুই মানুষ।

ফুলমতী মুখ ফেরাল — কেডা ওহানে?

ইয়াসমীন চমকে বর্তমানে ফিরল। নোটগুলো ফুলমতীর কোলে ছুড়ে দিয়ে বলল — টাকাটা রাখ। বাচ্চার দুধ কিনিস।

পরদিন সারাটা বেলা কুসুম বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল না। প্রবল জ্বরে গা-হাত-পা পুড়ে যাচ্ছে তার। অনবরত কাশছে, জ্বরের মাঝে প্রলাপ বকছে — মা! মা লো। কই তুই?

হুরী কাপড় ধুতে যাচ্ছিল। যেতে যেতে আক্ষেপ করে বলল — আমাগো আবার মা!

মর্জিনা বলল — মাটিতে পইড়্যা রইছে ছেড়ি। কাশের ব্যারাম। ঠাণ্ডায় তো বাড়ব। অরে নিয়া শান্তির ঘরে শোওয়াইলে কেমুন হয়? শান্তি তো ছুটিতে গ্যাছে। আর ঘরটা খালিই পইড়্যা রইছে।

কথাটা মন্দ না। ভাবল ইয়াসমীন। শান্তি ছুটিতে গেছে মানে দু'সপ্তাহের জন্য দেশের বাড়িতে গেছে। ইয়াসমীন বলল — মাসিকে বলে দেখ না! মাসির কাছে চাবি আছে। আমি দেলোয়ার এলে ডাক্তার আনতে পাঠাব।

ইয়াসমীনের কথা শুনে মর্জিনা অবাক হয়ে গালে হাত দিল — কও কী তুমি? এই বেশ্যাপাড়ায় কারো ব্যারাম-আজার হইলে ডাকতর আহে কবে? ব্যারামে ধরলে হায়াত থাকলে বাঁইচ্যা উঠে। না হইলে মইরা যায়। ডোমে আইয়া লাশ লইয়া যায়।

জ্বরের মধ্যে প্রচণ্ড কাশতে লাগল কুসুম। কাশির দমকে ওর ছোট্ট, শীর্ণ দেহটা ধনুকের মতো বাঁকিয়ে গেল। ইয়াসমীন উদ্বিগ্ন মুখে ওর বুকে-পিঠে হাত ঘষতে লাগল। ছটফট করছে কুসুম। হঠাৎ প্রবল কাশির দমকে কুসুমের শরীরটা দুমড়ে-মুচড়ে দলা হয়ে গেল। কাশির সঙ্গে মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে আসছে। তেল চিটচিটে কাঁথা-বালিশ ভিজে যাচ্ছে।

মর্জিনা অস্ফুট চিৎকার করে উঠল — হায়! হায়! কী সর্বনাশা কারবার! মুখ দিয়ে দেহি রক্ত উঠবার লাগছে।

ইয়াসমীন দ্রুত হাতে কাঁথার কোণ দিয়ে ওর মুখের রক্ত মুছিয়ে দিয়ে বলল — মর্জিনা দেখ তো বোতলে সর্ষের তেল আছে নাকি? গরম করে দে। ওর বুক-পিঠে মালিশ করে দিই।

মর্জিনা শুকনোমুখে বলল — ত্যাল পামু কই? ত্যালের যে দর! দেহি বকুলের কাছে

পাই নিকি?

কুসুম নিস্তেজ লতার মতো কুঁকড়ে গেছে। ওর দু'গালের পাশে রক্তের ছাপ। মর্জিনা একটু পরেই রংচটা এনামেলের বাটিতে কয়েক ফোঁটা তেল নিয়ে ফিরল। চুলো জ্বালিয়ে তেলটা গরম করতে করতে বলল — বকুলডা মনিষ্যি না। এট্□টু ত্যাল চাইছি, ভেংচি কাটল কেমুন। কয় 'বিলানের লিগাই এত পয়সা দিয়া ত্যাল কিনা আনি!' আইচ্ছা তুমি কও বু, অর না হইলে অহন বাজারে উঠতি দর। রোজ মাছগোস্ত খায়। তাই কইয়া এত গরম দেহায় ক্যান? এই পাড়ায় কে যে কহন কোন অবস্থায় পড়ব কেউ কইবার পারে না।

গরম তেল কুসুমের বুকে-পিঠে মালিশ করতে শুরু করল ইয়াসমীন। ঝুঁকে পড়ে ডাকল — কুসুম! এই কুসুম!

কুসুম চেতনাহীনের মতো পড়ে আছে। কষ্টে চোখ খুলল। কথা বলতে পারল না।

মর্জিনা বেরিয়ে যেতে যেতে হা-হুতাশ করল — আরে পোড়া-কপাইলা বাড়ি। এহানে যারা থাকে তারা বিলাই-কুত্তারও অধম। দাপাইয়া মরলেও কেউ জানব না।

বিকেলের আগে দেলোয়ার এলো। কুসুমকে দেখে ডাক্তার নিয়ে এলো। ডাক্তার কুসুমকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে বললেন — হাসপাতালে নিতে হবে। রক্ত পরীক্ষা করা দরকার। এক্স-রে করতে হবে। তাছাড়া এই আলো-বাতাসবিহীন স্যাঁতসেঁতে ঘরে থাকলে অবস্থা আরো খারাপ হবে।

দেলোয়ার ডাক্তারের ফিস দিয়ে প্রেসক্রিপশান মতো প্রাথমিক কিছু ওষুধপত্র কিনে আনল।

কালু কোথায় থেকে খবর পেয়ে এসে হুলস্থূল বাধিয়ে দিল। টান মেরে কাঁথাটা ছুড়ে ফেলে কুসুমের অচৈতন্য দেহেই একটা লাথি মেরে বসল। চোখ লাল করে দেলোয়ারকে বলল — তুমি এত ফুটানি দেহানের কে? কার মাইয়া তুমি হাসপাতালে নিবা? কার এত সাহস আছে যে আমার পয়সার কিনা মাইয়া এই পাড়া থেইকা বাইর কইরা নিব?

নিয়মিত যাওয়া-আসায় পাড়ার গুণ্ডাদের সঙ্গেও ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে দেলোয়ারের। কালুর একটা হাত ধরল দেলোয়ার — মেয়েটাকে হাসপাতালে না নিলে ও এমনিই মরে যাবে। তাছাড়া ওর কাশির অসুখ। এ-অসুখ আরো দশজনের হবে।

কালু খারাপ মেজাজে চিৎকার করে উঠল — আরে ফালাইয়া থোও তোমার হেকিমি।

অর পিঠে দুইডা লাথ্□থি পড়লে অহনি ঠিক হইয়া যাইব।

ইয়াসমীন এগিয়ে এলো — কালু! এ পাড়ার মেয়েরা মরে গেলেও কেউ চেয়ে দেখে না। একজন মানুষ ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। তুমি কেন বাধা দিচ্ছ?

জমে উঠা মেয়েদের ভিড়ে গুঞ্জন উঠল। কুসুমের চিকিৎসার পক্ষেই সবাই অনুচ্চ কণ্ঠে মন্তব্য করছে।

কালু রেগে আগুন হলো। বলল — বুঝছি, এই বিবির ঘরে কুসুমিরে থাকবার দিয়াই ভুল হইছে। লম্বা চওড়া লেকচার দিবার আইছে সব দল বাইন্ধা।

তারপর সকলের স্তম্ভিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে কালু এক কাণ্ড করল। জ্বরে অচেতন কুসুমের পা ধরে টেনে নিয়ে জরিনার ঘরে ফেলল। বলল — ওই জরি তর ঘরে থুইয়া গেলাম। কেউ অর কাছে আইলে কবি একেবারে ছোরা পিনাইয়া দিমু তার প্যাটে।

কালু বেরিয়ে গিয়ে মান্নানের দোকান থেকে সিগারেট ধরাল।

জটলাটা ভাঙলেও আলোচনা চলল অনেকক্ষণ। কেউ কালুকে দোষারাপ করল। অনেকে ইয়াসমীন আর দেলোয়ারের আদিখ্যেতা নিয়ে টিপ্পনী কাটল।

মাসি সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বলল — কালুর মাইয়া, কালু যা খুশি তাই করবার পারে। ইয়াতে কার কী কওনের আছে!

জরিনাই প্রথমে ফুঁসে উঠল। ইয়াসমীনের ঘরে এসে বলল — ইয়াসমীন বু, কও তো ওই কাইল্যাডারে খুন কইরা ফালাই। কাশের লগে যে রক্ত উঠতে আছে ছেড়ির।

মর্জিনা চুলোর জ্বাল ঠেলে দিয়ে তীব্রগতিতে মুখ ফেরাল — ক্যান? আমরা মরা হিয়াল-কুত্তা নিহি যে মাইনষে হউনের নাগাল আমাগো খুবলাইয়া খাইব?

হুরীও মুখ ঝামটা দিল — নাঙ্গেগো কাছে গতর বেচি আমরা! হেই গতরডার উপরও আমাগো দাবি নাই?

ইয়াসমীন এতক্ষণে বজ্রাহত হয়ে বসেছিল। ঘরে চৌকির ওপর নিরুপায় প্রতিমূর্তি হয়ে বসে আছে দেলোয়ার।

ইয়াসমীন হুরীর দিকে তাকাল — তোদের এই অবস্থার জন্য তোরা নিজেরাই দায়ী।

বকুল এসে দাঁড়াল দরজায়। বলল — কয়জন মাইয়া আর নিজের ইচ্ছায় এই ব্যবসায় আহে! কালুর মতো মাইনষেই তো আমাগো আইনা এহানে ফালাইছে।

দেলোয়ার এতক্ষণে একটা পত্রিকা মেলে ধরল ইয়াসমীনের সামনে — এই দেখ, বাইরের একটা কাগজে এখানকার মেয়েদের দুরবস্থার কথা ফলাও করে বেরিয়েছে। মানুষের মধ্যে হৈচৈ পড়ে গেছে। অবশ্য যারা সেনসিবল মানুষ।

ইয়াসমীন কাগজটা নিয়ে জোরে জোরে পড়ল — 'ঢাকার পতিতালয়'।

বকুল, মর্জিনা, হুরী ঘিরে ধরল ইয়াসমীনকে — কী লেখছে গো বুজি?

ইয়াসমীন কাগজে চোখ বুলাল — আমাদের কথা। আমাদের দুঃখের কথা।

মর্জিনা অবাক চোখে বলল — হাচাই।

— হ্যাঁ। মানুষ বোধ হয় আজকাল আমাদের কথা ভাবছে।

ওদের সবার চোখ সজল হয়ে উঠল। কুসুমের ব্যাপারটা ওদের সবার মনে নাড়া দিয়েছে। ইয়াসমীন দেখল ওদের সজল চোখে দুঃখী মুখে ব্যাকুল আগ্রহ। সেদিন যখন ইয়াসমীন ওদের কাছে ভিনদেশের মেয়েদের দুর্দশা-মুক্তির গল্প করেছিল, তখন ওদের নির্বোধ চোখে ছিল অবিশ্বাসের সংশয়। হয়তো দেলোয়ারের সঙ্গে মেলামেশা আর ইয়াসমীনের সংস্পর্শে ওরা ক্ষীণ আলোর একটা রেখার আভাস নিয়ে নিজেদের মানুষ বলে ভাবতে শুরু করেছে। কিন্তু ওরা জানে না সেই মানুষ বলে অধিকার নিয়ে দাঁড়াবার মুক্ত দ্বারটা কোথায়? কেমন করে সে দরজা পার হবে!

ইয়াসমীন বলল — জরি, তুই কুসুমের ওষুধগুলো নিয়ে যা। আমার কাছে শুনে নিস কখন কোনটা খাওয়াতে হবে।

ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায় ওষুধের প্যাকেট নিয়ে জরিনা বেরিয়ে গেল।

কাগজটা দেখতে দেখতে ইয়াসমীন বলল — কেবল ঢাকার পতিতালয়ের কথা বলে তোমরা দায়িত্ব শেষ করেছ! সারা পৃথিবীতে কত কোটি কোটি মেয়ে এই নরকযন্ত্রণা ভোগ করছে, কে বলবে তাদের কথা?

মেয়েরা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যার যার কাজে চলে গেল। কাগজের পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে একজায়গায় দৃষ্টি নিবন্ধ হলো ইয়াসমীনের। ঠোঁটের কোণে তার স্বভাবসিদ্ধ বিদ্রূপের হাসি ঝলসে উঠল — তোমাদের সমাজের মেয়েরা নারী আন্দোলন নিয়ে খুব মেতেছে দেখি! প্রায়ই এসব কাগজে পড়ি। আচ্ছা নারীমুক্তি বলতে তারা কী বোঝে?

দেলোয়ারও হাসল — সারা পৃথিবীতে নারীমুক্তির হুজুগ উঠেছে। আমাদের মেয়েরাও

সেই স্লোগানে গলা মিলিয়ে আধুনিক হচ্ছে।

ইয়াসমীন কাগজটা দুমড়ে-মুচড়ে ছুড়ে ফেলল ঘরের এক কোণে — যারা এই আন্দোলন করছে তারা জানে কত অসংখ্য মেয়ে পুরুষের বিকৃত কামনার শিকার হয়ে বন্দি জীবন কাটাচ্ছে? আগেকার দিনের হেরেমের দাসী-বাঁদী-বন্দিনীরাও এত যন্ত্রণায় দিন কাটায়নি।

দেলোয়ার আবার হাসল — এসব তারা খোঁজ রাখে কোথায়! ধনী গৃহিণীরা শখের সভা-সমিতি-সেমিনার করে নারীর মুক্তি খুঁজছে। চাকরি-বাকরির সুবিধা, লেখাপড়া, অফিস-আদালতে, ঘরে পুরুষের সমান অধিকার আদায় নিয়েই তারা ব্যস্ত।

ইয়াসমীন ধমকে উঠল — হেসো না, তাদের বলে দিও কুসুমের কথা, পিরু, মমতা, পারুলের কথা, এ পাড়ার মতো অসংখ্য পাড়ার মেয়েদের কথা। পারলে প্রশ্ন করো নারীর সত্যিকার মুক্তি পুরুষের কবল থেকে ছিনিয়ে আনবার সাহস তাদের আছে কিনা?

দেলোয়ার উঠল — আজ চলি। কতকগুলো বই রেখে গেলাম, পড়ো সময় পেলে। আমি কাল একবার আসব। কালুকে বুঝিয়ে কুসুমের জন্য কিছু করা যায় না-কি দেখি।

পরদিন দেলোয়ার আসবার আগেই ভোরবেলা কুসুম মারা গেল। পাড়ার মেয়েরা নিষ্প্রাণ বোবা চোখে কুসুমের অভুক্ত লাঞ্ছিত মৃতদেহটা দেখল। সবার অন্তরে হাহাকার উঠল। কিন্তু সে হাহাকার কারো বুক ভেদ করে এই ভাঙাবাড়ির সরু গলির দু'পাশের বাধা অতিক্রম করে দূরে পৌঁছল না। আর কয়েকদিন না যেতেই অনেক ঘটে যাওয়া ঘটনার মতো কুসুমের কথাও সবাই ভুলে গেল। শুধু মাঝে মাঝে দুপুরে মান্নানের দোকানে যখন অল্পবয়সী কোনো মেয়ে দাঁড়িয়ে ধারে জিনিস চায়, অথবা যখন সন্ধ্যায় ছেরুর তাড়ির জমজমাট দোকানে হিজড়ারা কুশ্রী দেহভঙ্গি করে সিনেমার চালু গান গায়, মেয়েরা গলিতে সারি বেঁধে দাঁড়ায়, খরিদ্দার আসতে থাকে, যখন মলিন বেশ, রুক্ষ চুল, অপুষ্ট শরীরের, অপরিণত যৌবনের বেসাতি নিয়ে একঘেয়ে সুরে শরীরের কলাকৌশলের পারদর্শিতার বিবৃতি দিয়ে খরিদ্দারের পেছন পেছন ছুটে জামা আঁকড়ে ধরে, ইয়াসমীন চমকে উঠে তখন। ওর তখন কুসুমকে মনে পড়ে। তারা-ভরা অপরিসর আকাশে দৃষ্টি মেলে বিষণ্ন অন্যমনস্কতায় ইয়াসমীন ভাবে — আর কতদিন এই বন্দিনারীর দল অসহ্য জীবনের বোঝা টেনে টেনে ক্ষয় হতে থাকবে?

॥ ৯ ॥

দু'সারি শ্রীহীন ভাঙা দালানের মাথার ওপর রোদ মরে আসে। স্যাঁতসেঁতে আলোহীন নোংরা বাড়িতে বেলা গুটিয়ে বিবর্ণ মরা সাপের খোলসের মতো পড়ে থাকে। জাহানআরাও বিবর্ণ হয়ে ওঠে। জৌলুস কমে আসে তার। সারা শরীরে গরলের মতো চাকা চাকা হয়ে ফুটে ওঠে ঘা। ওরা বলে গর্মির ব্যামো। এ অসুখে তো কত মেয়েই ভুগছে এ বাড়িতে। তবু জাহানআরার রোগটা সবার কাছেই একটা পরম ঔৎসুক্যের ব্যাপার।

জাহানআরার ভাগ্যের অতিমাত্রায় প্রসন্নতাকে যারা এতদিন ঈর্ষা করেছে, তারা মুখ মুচড়ে হাসল — কই গেল এত পয়সাওয়ালা দামি দামি কাস্টমার? এত শাড়ি-গয়নার ফুটানি! গাড়ি চইড়া হাওয়া খাওন? দিন গ্যাছে। সবতেরই যায়। বেশ্যার কপাল হইল পূর্ণিমা-আমাবইস্যার জো।

জাহানআরা বোরকা চড়িয়ে সপ্তাহান্তে একবার ডাক্তারের কাছে যায়। ডাক্তার বলেছে সেরে যাবে। জাহানআরা উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে। সারলেই কী! ব্যবসা তো নষ্ট হয়ে গেছে। তার এতদিনের বাঁধা কাস্টমার পয়সাওয়ালা উকিল এখন বকুলের ঘরে যায়। জাহানআরার সুদিনের মধুলোভীর দল সব উড়ে গেছে। নিঃসঙ্গ-রোগাক্রান্ত জাহানআরা একা ঘরে শুয়ে থাকে। ময়না এখন আর তার ঘর-দোর সাফ করে না। ভাঙা ঘরটাকে শ্রীহীন বিগতযৌবনা নারীর মতো করুণ মনে হয়। জাহানআরা শুয়ে শুয়ে কাঁদে। দোকান থেকে বাংলা মদ আনিয়ে খায়। এক বোতল মদ আনার জন্য ময়নাকে দশবার ডাকাডাকি করতে হয়। বেশি ডাকলে ময়না নিচে থেকে ঝংকার দেয় — দিনে এতবার দোকানে পাঠাইলে আমার চলে ক্যামনে? আমার তো টাইমের দাম আছে।

জাহানআরা মাঝে মাঝে ক্ষেপে উঠে। কুৎসিত ভাষায় গালাগাল দেয় ময়নাকে, বাড়িসুদ্ধ সবাইকে। সারা পৃথিবীর ওপর তার রাগ হয়। একদিন দেওয়ালের নারীমূর্তির ছবিটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ল জাহানআরা। তারপর তার বিগত দেহ-প্রেমিকদের নাম ধরে গালাগালি করতে করতে একা ঘরে পাগলের মতো দেওয়ালে মাথা কুটতে লাগল নিরুপায়, নিঃসহায় জাহানআরা।

পিরু, পারুল, মমতা থাকত যে ঘরটায়, সেখানে বেড়া দিয়ে ঘিরে মাসি আবার একটা

ঘর তুলে দিল। হীরু দামি মেয়ে এনেছে। পনের-ষোল বছরের মেয়েটার শরীর এখনি এমন ভরে উঠেছে যে, তাকে দেখলে বাইশ বছরের পরিপূর্ণ একটি যুবতী মনে হয়। টানবাজারের মেয়ের দালালের কাছ থেকে আটশ টাকা দিয়ে মেয়েটাকে কিনে এনেছে হীরু। মাসির কাছে বলেছে — মাল একখান আনছি এইবার। দেইখো, বছর না যাইতে একেবারে জাহানআরা হইয়া যাইব গোলাপি।

মেয়েটার নাম গোলাপি। কোথায় দেশ, বাড়িঘর, কেমন করে দালালের হাতে পড়ল কেউ জানতে পারল না।

উদ্ভ্রান্ত, হতচকিত গোলাপি এ বাড়িতে ঢুকেই যেন বোবা হয়ে গেছে। সারাদিনের মধ্যে সে একফোঁটা নড়ল না। অনড় পাথর হয়ে বসে রইল। কেবল ওর দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল অজস্র অসহায় অশ্রু।

মর্জিনা বলল — কাইন্দা কী করবা সোনা। এই পাড়ায় কাইন্দা ভাসাইয়া কইলজা ফাডাইলেও কোনো উপায় নাই।

গোলাপি কারো সঙ্গে কথা বলে না একটাও। দুপুরে হীরু দোকান থেকে খাবার কিনে পাঠিয়েছিল। খাবার ছুঁয়েও দেখল না সে। কখন এক সময় রহিমন এসে খাবারের থালাটা তুলে নিয়ে ছুট মারল। ড্রেনের ধারে বসে গোগ্রাসে খেতে খেতে বলল — ভাতটি না খাইলে তো কুত্তায় খাইত।

বুড়ি গোলাপজান একটু দূরে বসে লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল রহিমনের খাবারের দিকে। রহিমন গাল দিয়ে উঠল — মর্ মাগি বুড়ি। মউত তোরে চক্ষে দ্যাহে না? কুসুম মরল। মমতা, পিরু সব জোয়ান মাইয়াডি মইরা গেল। আর তর বুড়ি মউত নাই। ড্রেনের পারে পইড়্যা দাপাইয়া বাইচ্যা রইছস। তর বাচনের কাম কী?

গোলাপজান একদলা থুথু ছিটিয়ে দুর্বোধ্যভাবে কী যেন বলল। তাড়াতাড়ি ভাত মুখে তুলে হাত দিয়ে থালা আড়াল করে রহিমন চোখ পাকাল — খবরদার মাগি, গাইলাবি না। আমার বলে ভোকে পরাণ যায়। ছিনাইয়া আনছি একখান থনে ভাত।

হুরী পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে বলল — ওডা তো মরাই। অরে আর গাইলাস ক্যান লো!

সন্ধ্যার আগেই হীরু কজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এলো। হীরুর বন্ধুরাও হীরুর মতোই দুর্ধর্ষ।

একজন দামি বিলেতি মদের বোতল বগলে করে নিয়ে এসেছে। গোলাপিকে টেনে-হিঁচড়ে ঘরে তুলল হীরু।

মাসি বলল — সাইতের সময়ডায় আমাগো কিছু খাওয়াবি না রে হীরু?

হীরু লাল চোখে তাকাল — ছেড়ি কেমুন ঘাড় ত্যাড়া করতে আছে দেহ না! এইডারে আগে ঠিক কইরা লই।

মাসি সিগারেট খেতে খেতে মুচকি হাসল — বাজারথনে মুরগিডা কিনা আনলেও দুইদিন পায় দড়ি বাইন্দা রাখন লাগে। পরে আপনেই খোঁয়াড়ে যায়। ঠিক হইয়া যাইব দুইদিন পরেই।

বন্ধুবান্ধব সমেত হীরু গোলাপিকে নিয়ে ঘরে ঢুকল!

মেয়েরা সবাই আসন্ন বৈকালিক প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। ইয়াসমীন বিছানায় শুয়ে অল্প আলোয় বই পড়ছিল। মর্জিনা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বিষণ্নকণ্ঠে বলল — ছেড়ির আইজ রোজকেয়ামত হইব। এমনেই নতুন। তার উপরে তিন-চাইর জন ভারি ভারি জোয়ান মর্দ ঘরে ঢুকছে। আইজ তো অর সাইতের দিন।

ইয়াসমীন পড়ায় মগ্ন। মর্জিনার সব কথা শুনতে পেল না। হুরী ঘরে এলো একটু পরেই। বলল — ছেড়িডা যা চিল্লাইতে আছে। আহা রে। কয় 'আমি খাই নাই কোনোদিন। তোমরা আমারে মদ খাওয়াইও না।' তিন-চাইর ব্যাডায় ঠাইসা ধইরা অর গলায় বোতল ঢালতে আছে। আরে বাবা না খাইয়া করবি কী?

হঠাৎ বিকেলের বাতাসহীন আধ-অন্ধকার গলিতে গোলাপির আর্তচিৎকার ছড়িয়ে পড়ল। এমন কোনো তিক্ত ভয়ংকর স্মৃতির কথা মনে পড়ে প্রত্যেকেই শিউরে উঠল। সবাই বুঝতে পারছে গোলাপির ওপর এখন কী নিষ্ঠুর অত্যাচার চলবে।

আবার চিৎকারের শব্দ ঘরের দেওয়ালে আছড়ে পড়ল। ইয়াসমীনের চেতনা বইয়ের জগৎ থেকে ছিটকে এসে পড়ল অন্ধকারের কঠিন বাস্তবে।

বইটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ইয়াসমীন। সারা শরীরে উন্মত্ত লাভার স্রোতের মতো রাগের উত্তপ্ত ঢেউ নিয়ে হুরীকে প্রশ্ন করল — ওরা ক'জন রে?

মর্জিনা উত্তর দিল — তিন-চাইর জন তো দেখলাম।

অন্ধ রাগে ইয়াসমীনের সারা শরীর কাঁপছে। বলল — এ বাড়িতে এতগুলো মেয়ে সবাই

যদি ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা কী করতে পারে?

মর্জিনা বিস্ফারিত চোখে তাকাল — তোমার কি মাথা খারাপ হইল নি ইয়াসমীন বু! হীরুর কিনা মাইয়া লইয়া ও যা ইচ্ছা তাই করবার পারে। আমাগো কী তাতে?

ইয়াসমীন দমল না — দুনিয়ার কেউ কারো কেনা নয় রে মর্জিনা।

হুরী বিরক্ত হলো। বলল — অতসব কথা আমরা বুঝি না। ওই সব তোমাগো বইতেই ল্যাখ্যা থাকে। ওই ডাকাইত গো লগে আমরা পারুম ক্যামনে?

ইয়াসমীন রেগে উঠল — তোরা আমার সঙ্গে যাবি কিনা বল।

মর্জিনা ইয়াসমীনের হাত চেপে ধরল — বহ। মাথা গরম কইরো না। এই বাড়িতে এতদিন থাইকাও তুমি এমুন বেবুঝ হও ক্যান! জানো ওরা কত খুনখারাবি করছে?

গোলাপির অসহায় আর্তনাদ পাক খেতে লাগল চারদিকে। আছড়ে পড়তে লাগল ঘরে ঘরে। ইয়াসমীন যেন পাগল হয়ে গেল সে আর্তচিৎকারে। অসম্ভব। অসহ্য। আর নয়। প্রতিবাদ করতেই হবে। কতদিন আর বিকৃতরুচি পুরুষের অন্যায়-অত্যাচারের শিকার হয়ে নারীরা এমন নিষ্ফল চিৎকারে দীর্ণ হবে। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ইয়াসমীন। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠল। নিচে তখন প্রায় সারাটা পাড়ার মেয়েরা এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। একটা অবশ্যম্ভাবী ভয়ংকর কিছুর আশঙ্কায় সবাই ভীত-উচ্চকিত। এক ধাক্কায় ঘরের ঝাঁপ খুলে ফেলল ইয়াসমীন। সঙ্গে সঙ্গে এক নিষ্ঠুর অমানুষিক দৃশ্য তাকে যেন বোবা করে ফেলল। নগ্ন দেহে বিধ্বস্ত নারী ভয়ে ছোটাছুটি করছে সারা ঘরে, ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে — তোমরা আমারে ছাইড়া দাও। তোমরা আমার বাপ। আমার ভাই। আল্লার দোহাই।

নেশাসক্ত লালসায় উন্মত্ত পুরুষ চারটি যেন ভয়াবহ পশু হয়ে গেছে। দু'জন তাকে মাটিতে চেপে ধরল। একজন উঠে দাঁড়াল ওর নগ্ন বুকের ওপরে। হীরু একপাশে বসে মদ খাচ্ছে। হাসছে। আর্তনাদ করে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল ইয়াসমীন। পিছে আরো দু-একজন বর্ষীয়সী উঠে এসেছিল। মাসি ইয়াসমীনকে পেছন থেকে টানল — আইয়া পড়্। আইয়া পড়্। এহানে গোলমাল করিস না।

ইয়াসমীন প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে উঠল — না।

ইয়াসমীনের চিৎকারে ঘরের সবাই ফিরে তাকাল। একজন নেশাজড়ান কণ্ঠে বলল —

আরেকটা মাল দেহি আইয়া গ্যাছে। ওইডারে ঘরে আন। ফুর্তি জমব ভালো।

একজন একটানে ইয়াসমীনকে ঘরের ভেতর এনে ফেলল। ইয়াসমীনের হাতের বইটা ছিটকে পড়ল মাটিতে।

ইয়াসমীনকে ঘরে টেনে নিতেই মেয়েরা এসে ভেঙে পড়ল সিঁড়িতে, বারান্দায়।

মর্জিনা, হুরী, শান্তি, বকুল চিৎকার করতে লাগল।

জরিনা বলল — ওই হীরু, ইয়াসমীন বুরে কিছু করলে আমরা সবটিতে তগো খুন কইরা ফালামু।

মেয়েদের চেঁচামেচি, হৈচৈতে হীরু ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করে দিল। একটা হট্টগোল বেধে গেল। জমে ওঠা ফুর্তিতে বাধা পড়ায় হীরু ক্ষেপে উঠল। বাইরে বেরিয়ে ধমক দিল — ওই মাগিরা, সইরা যা সব এহান থেইকা। না হইলে ভালো হইব না।

মেয়েদের মধ্য থেকে কে যেন বলল — কী করবি? তরা চাইর জন। আমরা এতডি মাইয়া। একটা কইরা কিল দিলেও তো ভর্তা হইয়া যাবি।

মাসি মেয়েদের গালাগাল শুরু করল — ও ছেনালের গুষ্টিরা! তরা পাইলি কি! চোখ-কান-ফুইট্যা গ্যাছে দেহি খুব। অহনই থানায় খবর দিমু। পুলিশ আমার হাতে। পিটাইয়া তগো লাশ বানাইব।

মর্জিনা রুখে উঠল — থোও ফালাইয়া তোমার পুলিশ। পুলিশ ডাইকা ডর দেখাইয়া মাসে একবার কইরা পয়সা লও তুমি আমাগো থেইকা। বুঝি না আমরা কিছু?

মেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের দরজায়। যেন একটা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি হঠাৎ জেগে উঠেছে।

মাসি উত্তেজিত মুখে চিৎকার করতে লাগল — খুব মুখ ছুটছে মাগিগো। অহনই আমি গুণ্ডা গো খবর দিমু। নাম সব। নাম।

জরিনা আগুনভরা চোখে ফিরল — যা পারো কর গিয়া, আমরা আর ডরাই না।

হুরী ভিড় ঠেলে উঠে গেল ওপরে। বেড়ায় লাথি মেরে বলল — ওই খানকির পুত হীরু! বাইর কইরা দে ইয়াসমীন বুরে। নইলে ভালো হইব না।

ঝাঁপ খুলে হীরু ভয়াল চেহারা নিয়ে তেড়ে এলো — কী করবি রে হারামিরা? তগো সবটির প্যাট ফাসাইয়া কুয়ায় ফালামু।

জরিনা কোমরে হাত দিয়ে রুখে উঠল — আগুন দিমু। আগুন দিমু তর ঘরে। আগুন দিমু এই পাড়ায়।

এরই মধ্যে ময়না টিটকারি দিল — ভালোই হইব। তগো ঘর জ্বলব। ব্যবসা উঠব। তরাই পুইড়্যা মরবি।

ময়না আর মর্জিনার মধ্যে বচসা শুরু হয়ে গেল। কয়েকজন তেড়ে গেল ময়নার দিকে। আর তখনি একটা প্রচণ্ড আর্তচিৎকার উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ঝাঁপ ভেঙে গেল মেয়েদের প্রচণ্ড সম্মিলিত ধাক্কায়। দুড়দাড় করে বেরিয়ে গেল কজন পুরুষ। উত্তেজনার আগুন নিস্তব্ধ। মেয়েরা নির্বাক। হীরু দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে। তার পায়ের কাছে রক্তে ভাসছে ইয়াসমীন।

সবাই বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল কয়েকবার দাপাদাপি করে পেটে ছুরির ঘাই খাওয়া ইয়াসমীনের অর্ধনগ্ন দেহটা নিস্পন্দ হয়ে গেল। হীরুর চোখ টকটকে লাল! হাতে রক্তমাখা ছুরি। হীরু বাইরে এলো।

মেঝেতে পড়ে থাকা ইয়াসমীনের বইয়ের পৃষ্ঠা ছিঁড়ে রক্ত মুছে কাগজটা ছুড়ে দিল হীরু কিছুক্ষণের জন্য বজ্রাহত, নির্বাক হয়ে যাওয়া মেয়েদের সামনে।

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল — দ্যাখ ছিনালেরা! এইবার চক্ষু মেইল্যা দ্যাখ হীরু কী করবার পারে।

পিছিয়ে গেল মেয়েরা। মার খাওয়া পরাজিত পশুর মতো বেদনাহত চোখে ইয়াসমীনের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রক্তমাখা কাগজটা ওদের সামনে। ওরা শুধু কাগজের এক পিঠের রক্ত দেখল। ওরা জানল না কাগজের আরেক পিঠে লেখা সর্বকালীন সত্যের সেই বিখ্যাত বিদগ্ধ উক্তি : 'ম্যান ইজ বর্ন ফ্রি, বাট এভরি-হোয়্যার ইজ ইন চেইন।'

নিস্তব্ধ বজ্রাহত বাড়িটায় তখন একটি শিশুর স্বাধীন প্রতিবাদের কান্না বেজে উঠল। ফুলমতীর বাচ্চা কাঁদছে প্রবল চিৎকারে।

=o=